# কৃষ্ণপক্ষ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৮

( মহালয়া )

মূল্য দুই টাকা আট আনা মাত্র

৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত; ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬, বাণী-শ্রী প্রেস শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রচ্ছদপট চিত্রিত।

শিল্পী সুনীলমাধব সেনগুপ্ত
অরুণা দেবী
করকমলেষু

# কৃষ্ণপক্ষ

## এক

কলকাতা শহরে রাত বারোটার ঘড়ি বাজা শেষ হল।

অনেক ধরে বাজছিল—প্রায় পনেরো মিনিট। দূরে, কাছে, কখনো কখনো একেবারে শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রান্তসীমায়। কোনোটা তীক্ষ্ণ, কোনোটা গম্ভীর, কোনোটা সদিবসা ঘড়ঘড়ে গলার মতো। রাত্রির হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন কী একটা কারণে চমকে উঠে এলোমেলো স্পন্দনে দোলা খেয়ে গেল খানিকক্ষণ।

দূরে কোথায় দ্রুত ঘণ্টি বাজিয়ে ছুটে গেল ফায়ার বিগ্রেড। একটা কুকুর ডাকছিল, থেমে গেল আচমকা। যেন কোথা থেকে কে একটা শক্ত মুঠি বাড়িয়ে গলাটা টিপে ধরল তার। বিডন স্ট্রীট্ বেয়ে মড়া যাওয়ার সাড়ম্বর ঘোষণা শব্দের একটা প্রেত-কুয়াশা রচনা করতে করতে মিলিয়ে গেল; জানান দিয়ে গেল পরলোকের সাইরেন। নিচের কলতলায় শোনা গেল মাছের কাঁটা নিয়ে ছুঁচোদের উত্তেজিত আলোচনা। ছাতের ট্যাঙ্কে বন্দিনী গঙ্গার একটানা কলধ্বনি।

একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো প্রতুল। মোড়ের গ্যাসটা ভুতুড়ে চোখের মতো দপদপ করছে। একটুকরো শুকনো শাল পাতা হাওয়ায় হাওয়ায় গলিময় ফরফর করে উড়ে বেড়াচ্ছে—যেন দক্ষিণা

বাতাসে অনুভব করছে সাঁওতাল পরগণার ফুলে ফুলে ভরা কোনো শালবনের স্মৃতি।

কপালের ওপর উড়ে পড়া রুক্ষ চুলগুলোকে সরিয়ে দিলে সে। বুক ভরে রাত্রির বাতাসটাকে টেনে নিলে একবার। তারপর আবার ফিরে এল নিজের টুলটিতে।

সামনে ইজেলের ওপর ছবি। তার নিজের আঁকা ছবি। আজ সাতদিন ধরে তার স্বপ্ন-কামনার রেখায়িত রূপ। 'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ধরি বাম করে'। উর্বশী উঠে আসছেন সমুদ্র থেকে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—জোয়ারের ঢেউ মাতাল হয়ে পায়ের কাছে ভেঙে পড়ছে—যেন ঢেলে দিচ্ছে একরাশ মল্লিকা ফুলের অঞ্জলি।

আশ্চর্য ভালো লাগছে ছবিখানাকে দেখে। চমৎকার কাজ হয়েছে। রাত বারোটার ঘড়ি বাজা শেষ হয়ে গেলে, বিচিত্র শব্দতরঙ্গের এই নির্জনতায় একটা নতুন চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে নিজের ছবিকে। যেন নতুন করে পরিচয় হচ্ছে নিজের সত্তার সঙ্গে ; নিজেকে আবিষ্কার করছে নতুন উপলব্ধির ভেতর দিয়ে।

দুটো একটা প্যাচ্-ওয়ার্ক বাকী। কিন্তু আর তুলি-ব্রাশ টেনে নিতে ইচ্ছে করল না। অনেকক্ষণ ধরে তুলি চেপে কাজ করতে করতে এখন তর্জনীর আগাটা টনটন করছে। তাছাড়া হঠাৎ যেন মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ ধরে ওই ছবিটা যে এঁকে চলেছিল—সে একটা দ্বিতীয় সত্তার মতো তার কাছ থেকে সরে গেছে। আপাতত আর ওতে হাত দেওয়া চলবে না।

নিজের লেখা ছন্দের কবিতা নিজের কাছেই কখনো কখনো গান হয়ে ওঠে ; 'মমেতি ন মমেতি চ'। নিজের আঁকা ছবি নেশার মতো

বিবশ করে কোনো কোনো মুহূর্তে। আত্মপ্রেমের ভাবালুতা চেতনাকে ঘিরে ঘিরে জাল বুনতে থাকে মাকড়শার মতো।

দরজা খোলবার মৃদু আওয়াজ পাওয়া গেল একটা। চমকে উঠল প্রতুল। মা।

—এখনো ঘুমোওনি মা?

—নাঃ—

মা সংক্ষেপে জবাব দিলেন। একটা মোড়ায় এসে বসলেন নিঃশব্দে।

—কী করছিলে এতক্ষণ?

—ভাবছিলাম।

তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন মা। প্রতুল একবার আধখানা চোখ তুলে তাকালো মার দিকে। সত্যি মা আজকাল বড় বেশি ভাবছেন। চোখের কোণের কালো কালো রেখা দুটো আরো প্রসারিত হয়েছে; দৃষ্টির ওপর দুটো কুয়াশার পর্দা দুলছে যেন; চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে গালের চামড়ার ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অতিরিক্ত মাত্রায়।

—এত ভাববার কী আছে? একটা অসুখ-বিসুখ বাধাবে নাকি শেষে?—কথাগুলো বলবার দরকার নেই জেনেও বলতে হল প্রতুলকে। রঙের ছিটে লাগা পায়ের কাছের মেজেটার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, যাও, এখন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো চুপ করে শুয়ে পড়োগে।

প্রথম কথাটা ছাড়া মা যেন আর কিছু শুনতে পেলেন না। নির্জীব বিষণ্ণ চোখ তুলে ধরে শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, এত কী ভাবি, সে কি তুমি জানো না?

জানি—জানি—চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল প্রতুলের। নিজের জন্যে কি এতটুকু অবকাশ নেই, নেই কোনো একটি নিঃসঙ্গ মুহূর্ত?

সেখানে নিজের সৃষ্টির ভেতর দিয়ে আত্মোপলব্ধি করা চলে, আবিষ্কার করা চলে মগ্নচৈতন্যের অধ্যায়ে অধ্যায়ে ?

নিজের রঙমাখা আড়ষ্ট তর্জনীটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল প্রতুল।

—এই সেদিনও তো দেড়শো টাকা এনে দিলাম। এর মধ্যে সব ফুরিয়ে গেল ?

—সেদিন !—মা হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু একটা জ্বালাভরা ব্যঙ্গের মতো ঠোঁটের কোনা দুটো শুধু বিস্তৃত হল একবার : সে তো আজ প্রায় তিন মাস আগেকার কথা। চারদিকের দোকানবাকী শোধ করতেই তো ও ক'টি টাকা ফুঁয়ে উড়ে গেছে। কাল থেকে তো আর— মা থামলেন।

—হাঁড়ি চড়বে না, কেমন ?– যেন মরিয়া হয়েই মা-র ছেড়ে দেওয়া কথাটাকে শেষ করে দিলে প্রতুল।

—সোজা করে বলতে গেলে তাই দাঁড়ায় বটে।—মা আস্তে জবাব দিলেন।

—ও !—একটা অন্ধ-আক্রোশে প্রতুল ঠোঁট কামড়ে ধরলে। বন্দিনী গঙ্গার কলধ্বনিতে আকুল কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হয়ে গেল। তারপর :

—তাহলে আর কটা দিনও দোকানবাকী দিয়ে চালাও, এর মধ্যে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—দোকানবাকী !—মা মাথা নাড়লেন : কত বাকী দেবে আর ? নাগমশাই তো দুবেলা এসে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছে, এরপরে অপমান করবে। কয়লাওলাই পাবে তিরিশ টাকা, দুধের হিসেব—

অসহ্য—অসহ্য ! একটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র মাথার ঘিলুগুলোকে কুরে কুরে বার করে নিচ্ছে। বিদ্যুৎচমকের মতো যন্ত্রণা খেলে যাচ্ছে

স্নায়ুতন্ত্রীর জাল বেয়ে, সামনে উর্বশীর ছবিটা হাসছে ডাইনির মতো; পায়ের তলায় সমুদ্রের ঢেউগুলো বিষফেনা বয়ে একরাশ সাপের মতো কিলবিল করছে।

—থাক, থাক, আর বলতে হবে না।

—না বললে তো চলবেনা বাবা।—পাথরের মতো কঠিন আর নিষ্ঠুর শোনালো মার গলার স্বর: এবার সত্যি সত্যিই চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করো একটা। ছবি এঁকে কারো কোনোদিন পেট ভরেনি, তোমারও ভরবে না।

হয়তো ভরবে না। হয়তো এই উলঙ্গ নিষ্ঠুর সত্যটার দাবী রাক্ষসের মতো সর্বগ্রাসী। কিন্তু! রাত বারোটার পরে একটা নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্ত। নিজের সঙ্গে পরিচয়ের একটা ভাবমগ্ন অবকাশ। তারও কি কোনো দাবী ছিলনা? নোনা ধরা ইঁটের সংকীর্ণ পরিসরে মাথা ঠুকে মরা শুকনো শালপাতাটার মতো স্বপ্ন নেই কি কোনো ফুলে ফুলে ভরা সাঁওতাল পরগণার শালবীথির?

মার কথার নয়, যেন নিজের মনের কাছেই জবাবদিহি করলে প্রতুল।

—তুমিও একথা বলছ মা? তুমি তো জানো, এর চাইতে বড় কাজ আমি আর ভাবতে পারিনা—আপনা থেকেই তার গলায় একটা নাটকীয়তার আমেজ এল: আমার যদি কোনো পরিচয় থাকে, সে এই। এরই ভেতর দিয়ে নিজেকে আমি প্রমাণ করে যাব।

মা ভ্রূভঙ্গি করলেন।

—ও সব বড় বড় কথা আমাকে বোঝালে কী হবে প্রতুল। সংসার তো বুঝবে না।

না, বুঝবেনা। নিজের মনের দরজাটা বন্ধ করে একটা পলাতক ভীত জন্তুর মতো লুকিয়ে থাকতে দেবেনা এক পলক। ঝন্ ঝন্ করে

ঘা দিতে থাকবে, আগল ভেঙে দেবে টুকরো টুকরো করে। অনিবার্য—অমোঘ।

বুকের ভেতর থেকে ঠেলে-আসা একটা চীৎকারকে খানিকটা ইমোশনের ভেতরে নিয়ন্ত্রিত করলে প্রতুল।

—তার জন্যে তুমি কি চাও, আমার এতদিনের কাজ সব নষ্ট করব? কয়েক লাখ কেরানীর সঙ্গে আর একটা সংখ্যা যোগ করে বাদুড় ঝুলব দশটা-পাঁচটার ট্রামে? হাতের রঙ্ মুছে ফেলে সেখানে আমি কালি মাখতে পারব না মা, আর কটা দিন অপেক্ষা করো।

—অপেক্ষা তো আজ পাঁচবছর ধরেই করছি—মা আবার হাসতে চেষ্টা করলেন। আবার জ্বালাভরা হাসির ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হয়ে গেল তাঁর ঠোঁটের কোনায় কোনায়।

ইচ্ছে করল দুহাতে নিজের গলাটাকে টিপে ধরে। বাঘের মতো নখ্ বসিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে ছবিটা। উর্বশী নয়, একরাশ শবদেহের ওপর ছিন্নমস্তা দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। গলির ভেতরে কুটুকুটু করে মাটি কাটছে ইঁদুরে। না—মাটি কাটছেনা, কুরে কুরে খাচ্ছে তার মস্তিষ্ককে।

প্রতুল হঠাৎ দৃষ্টি ফেলল মার দিকে।

—এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একখানা ছবি কিনবেন বলেছিলেন। ওইটে কাল নিয়ে যাব তাঁর কাছে। যদি পছন্দ হয়, মোটা দাম মিলতে পারে।

—বেশ—

নিস্তেজ নিরুৎসাহিত কণ্ঠে জবাব দিলেন মা। উঠে দাঁড়ালেন।

—আমার আর অল্প একটু দেরী হবে মা। ছবিটা শেষ করেই একেবারে শুতে যাবো।

মা আর কিছু বললেন না। যেমন নিঃশব্দ পায়ে এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দ ভঙ্গিতেই বেরিয়ে গেলেন। প্রতুল সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল হিংস্র ভঙ্গিতে। তারপরে আস্তে আস্তে কোমল হয়ে আসতে লাগল তার দৃষ্টি। না, কোনো দোষ নেই মার। বরং আশ্চর্য তাঁর সহিষ্ণুতা। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে কী মন্ত্রবলে কেমন করে সংসারের এই জোয়াল তিনি টেনে আসছেন, সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন একমাত্র তিনিই। প্রতিবাদ করেননি কখনো, অভিযোগ করেননি কোনোদিন। আজ যেটুকু বলে গেলেন এটুকু তাঁর ন্যূনতম দাবী—এই ভারবাহী ক্লান্ত জীবনে শুধু জানিয়ে গেলেন ছায়ার আশ্বাস পাওয়ার এতটুকু কামনা।

নিজেরই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল সে। দূরে শব্দের প্রেত-কুয়াশা সৃষ্টি করে আর একটা মড়া চলেছে। কলকাতায় বসন্ত এসেছে। এপিডেমিকের ঘোষণা দেখেছে কর্পোরেশনের পোস্টারে পোস্টারে। সত্যিই মড়ক লেগেছে নাকি? কিসে মরল লোকটা? বসন্তে না কলেরায়?

নাঃ—ছবিটা শেষ করতেই হবে। আর অপেক্ষা করা চলবে না আসন্ন একজিবিশনের সময় পর্যন্ত। কালই যেতে হবে আগরওয়ালার কাছে। সেকালের উর্বশীকে জয় করত পুরুরবার দল, একালের উর্বশী শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরিকা। সন্ন্যাসীর শুধু সে তপোভঙ্গই করে, কোনোদিন ধরা দেয় না তার জীবনে।

প্রতুল তুলিটা তুলে নিলে। রঙের মধ্যে নাড়াচাড়া করল অনেকক্ষণ ধরে। সাড়ে বারোটার শব্দটা আবার অনেকক্ষণ ধরে রাতের হৃৎপিণ্ডকে খেয়াল খুশিমতো দুলিয়ে চলল। সে টেরও পেল না।

তারপর একটা বাজল। তারপর দুটো। তারও পর তিনটে

বাজবার সঙ্গে সঙ্গে কাকজ্যোৎস্নার মোহে একদল কাক আচমকা ডেকে উঠল ওদিকের পার্কের গাছপালা থেকে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা ডুব দিয়ে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল প্রতুলের জানালাটার সামনে।

আবার নিঃশব্দ পায়ে দরজা খুলে মা ঘরে ঢুকলেন।

এক হাতে তুলি। টুলের ওপরে বসেই পাশের ছোট টিপয়টার ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে শিথিল ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রতুল।

মা বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন একটা বালিশ নিয়ে।

প্রতুলের মাথার নীচে সযত্নে রাখলেন বালিশটা। কিছুক্ষণ তাকালেন ছবির দিকে, কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে। তারপর মৃদু একটা নিঃশ্বাস ফেলে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ঘর থেকে।

জানালার পারে চাঁদটা কিন্তু থেমে রইল মার সজাগ চোখের মতোই। উর্বশীর ছবিটা এক ফালি ম্লান রূপালি আলোয় মায়াময় হয়ে রইল। আর বন্ধ গলির প্রাচীরে প্রাচীরে মাথা কুটে শাল-বনান্তের স্বপ্ন-বিভোর শুকনো পাতাটা উড়তে লাগল সমস্ত রাত ধরে।

ডালে কাঁটা দিচ্ছিলেন মা। ছেলের জুতোর শব্দে ফিরে তাকালেন।

—এই সাত-সকালেই বেরুচ্ছ কোথায় ?

—সেই ভদ্রলোকের ওখানে। —মার শান্ত জিজ্ঞাসাটা অনুভব করে উত্তরটাকে ব্যাখ্যা করে দিলে সে : যিনি ছবিটা কিনবেন বলেছেন।

ব্রাউন পেপারে মোড়া ছেলের হাতের প্যাকেটটার ওপর মা আর একটা দৃষ্টি ফেললেন।

—একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। কাল সারাটা রাত তো জেগেই কাটিয়েছ, খেয়েদেয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম করবে।

—আচ্ছা—

সৌজন্যের একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে প্রতুল বেরিয়ে এল। উদ্গত নিঃশ্বাসটাকে চেপে নিলে বুকের ভেতর। এত তাড়াতাড়ি ছবিটাকে বিক্রী করতে ইচ্ছে ছিল না। হয়তো এক্‌জিবিশনে একটা ভালো দাম পাওয়া যেত; তার চাইতেও বড় কথা, স্বীকৃতি মিলত শিল্প-রসিকদের কাছে, হাজার হাজার মুগ্ধ চোখের অভিনন্দনে চরিতার্থ হয়ে উঠত তার স্বপ্ন-সাধনা।

**কিন্তু!**

কলকাতার গলিতে মাথা ঠুকে মরা শুকনো পাতা। নেশাভরা ফুলে ফুলে সমাকীর্ণ মহুয়ার বন সে কতদূরে? ঝিরঝিরে পাথর কাটা ঝর্ণার পাশে পাশে কোথায় রক্তরাঙা পলাশবন? রাশি রাশি সুগন্ধি সাদা ফাগের মতো মুঠো মুঠো শালফুল কোথায় উড়ে যায় হাওয়ায়?

কলকাতা। নীল সমুদ্র নেই—গঙ্গার ঘোলা জলে পাট বোঝাই ফ্ল্যাট ভাসে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেনের দুর্গন্ধ ময়লা জল চেনে বাঁধা বন্যার চারদিকে আবর্তিত হয়ে চলে যায়। ক্ষতাঙ্কিত মুখে বীভৎস প্রসাধন করে মোড়ায় বসে সিগারেট টানে মাটির উর্বশী। গলির ভেতর আলো নিবিয়ে ঝিমোতে থাকে ছোটবড়ো মোটরের সারি—বন্ধকী জমিদারী আর ডুবন্ত-কারবারের পুরুরবাদের পুষ্পকরথ।

ইচ্ছে করছে একটা দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে দেয় ছবিখানাকে; তারপর অমানুষিক হিংস্র উল্লাসে তার ছাইগুলো উড়িয়ে দেয় বাতাসে। কিন্তু না। তার আগে আগরওয়ালার কাছেই যাওয়া দরকার।

—গরীবকে একটা পয়সা দিয়ে যাও বাবা। ভগবান ভালো করবেন।

আরণ্যক মাকড়শার শুকনো পায়ের মতো সামনে প্রসারিত একখানা কঙ্কাল হাত। আট ন বছরের একটা ছোট ছেলে।

—আজ দু'দিন খেতে পাইনি বাবা—

পাশ কাটিয়ে চলে গেল প্রতুল। কলতলায় মাছের কাঁটার অধিকার নিয়ে ছুঁচোরাও মারামারি করে। এটুকুও পারেনা কেন এরা? বড়বাজারের গুদামগুলোতে খেয়ে খেয়ে ইঁদুরগুলো হাতীর মতো মোটা মোটা হয়ে ওঠে, কেন তাদের মতো এরাও একটা রন্ধ্রপথ করে নেয় না কোনো চোরা গুদামে?

—ভগবান মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন বাবা—

পেছন থেকে শেষ আকুতি। প্রতুল ফিরে দাঁড়ালো। ফিরে গেল দু পা।

—এই ছোকরা, এদিকে আয়—

কঙ্কাল হাতখানা প্রত্যাশাভরে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—তুই ঠিক জানিস, ভগবান আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন? —একটা আনি ফেলে দিয়ে প্রতুল প্রশ্ন করল। ঘোলা দুটো চোখে ছেলেটা তাকিয়ে রইল বিস্মিত দৃষ্টিতে। পরক্ষণেই সামলে নিলে নিজেকে। যেন মুখস্থ করা কথা-কটাকে টেনে আনল জিভের আগায়।

—করবেন বই কি বাবু। তিনি যে ইচ্ছাময়।

—খুব তো কথা শিখেছিস দেখছি!—প্রতুল ভ্রূকুটি করলে: শোন্। ইচ্ছাময় যদি আমার ইচ্ছে পূরণ করেন, নগদ পাঁচ-পাঁচটি টাকা তোর বকশিস্ মিলবে। আর যদি না হয়, তাহলে দুই থাপ্পড় দিয়ে এই চারটে পয়সার শোধ তুলে নেব—মনে থাকে যেন।

দ্রুত এগিয়ে গেল। বিশীর্ণ মুখে সেদিকে তাকিয়ে হাসল ছেলেটা। স্বগতোক্তি করলে: পাগলা!

আরো দু পা সামনে ট্রাম স্টপ। প্রতুল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

—হ্যালো, প্রতুল যে!

পেছনে কার উল্লসিত গলার স্বর। কাঁধের ওপর কার বলিষ্ঠ হাতের সজোর চাপ।

তাকিয়ে দেখল, অপূর্ব। পাঁশনের ভেতর দিয়ে দুটো জ্বলজ্বলে কৌতুকভরা চোখে অপূর্ব তাকে দেখছে—যেন হাজার টাকা পুরস্কারের কোনো নিরুদ্দেশকে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছে সে।

## দুই

অপূর্বই বটে !

কিন্তু সে মানুষ নয়—যার ছেঁড়া লংক্লথের পাঞ্জাবীর কাঁধটা চটচটে হয়ে থাকত কালো ঘামে। মাসের শেষে পাইস্ হোটেলে খাওয়ার পাঁচটা পয়সাও থাকতনা যার হাতে, আরো সস্তার ডাল-রুটি খুঁজত উড়ের দোকানে। এক পয়সার মুড়ি, এক পয়সার তেলেভাজা আর এক কুঁজো জল দিয়ে রাতের খাওয়াটা মিটিয়ে নিত যে লোক।

এখন লক্ষ্মীলাগা চেহারা। ভাঙা কলসীর দুটো টুকরোর মতো চোয়ালের হাড়ের ওপর চর্বি আর মাংসের পুরু আবরণ। চিকচিক করছে নতুন পাটভাঙা সিল্কের বুশশার্ট। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বুনো চুলগুলোতে শ্যাম্পুর মসৃণ পারিপাট্য। সস্তা ফ্রেমের চশমার বদলে নিউ মাউণ্ট্ পাশ্‌নে। একটা বিড়ি যে দুবারে খেত, তার মুখে আধহাত লম্বা পাইপ।

বোঝা যাচ্ছে, সরস্বতীর বুড়ো খোঁড়া হাঁসটার পেছনে আর দৌড়ে বেড়ায়না অপূর্ব। বটগাছের কোনো অন্ধকার কোটরে লক্ষ্মীপ্যাঁচার জলজ্বলে চোখের সন্ধান পৌঁছে গেছে তার কাছে।

—হ্যালো, কেমন আছিস ?—ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে দরাজ গলায় অপূর্ব জানতে চাইল।

—চমৎকার।—সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে প্রতুল।

—আছিস কোথায় ? সেই ব্রজমোহন সাহা লেনেই ?—অপূর্ব একটা করুণা-মেশানো বিস্ময়ে কুঁচকে আনল নাকটাকে।

—কোথায় আর যাবো ? পৈতৃক বাড়ি।—প্রতুল হাসতে চেষ্টা করল : তুই ভাল আছিস নিশ্চয়ই ?

—চলে যাচ্ছে একরকম—আবার সেই দরাজ গলার উত্তর। নাকের ভেতর দিয়ে দুটো সূক্ষ্ম ধোঁয়ার রেখা ছেড়ে দিলে অপূর্ব। হ্যাঁ—চলে যাচ্ছে বই কি। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে স্ট্রীম্‌-লাইনড্‌ মোটরের গতির মতো নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দচারণা। আধখানা চোখ বুজে যেন সেই গতির আনন্দটাকে সে আস্বাদ করে নিলে।

তারপর :

নিজের কাছে নিজেকে ভালো লাগার আবেশ ধরানো গলায় বললে, চল্‌, একটু চা খাওয়া যাক।

—এখুনি খেয়ে বেরিয়েছি।—একটা বিজাতীয় অন্তরঙ্গতার কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় প্রতুল বললে, তা ছাড়া ওই আমার ট্রাম আসছে। পর পর দুখানা ছেড়ে দিয়েছি।

—পর পর দুখানা ট্রাম যে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিতে পারে, আরো খানকতক ছেড়ে দেবার মতো অপর্যাপ্ত সময় নিশ্চয় তার হাতে থাকে। অতএব চলে আয়—

একটা নরম মাংসল হাতে প্রতুলের কব্জীটা আঁকড়ে ধরলে অপূর্ব। আবার দুটো নাসারন্ধ্র দিয়ে সূক্ষ্ম সাপের মতো বেরিয়ে এল দুটি ধোঁয়ার রেখা।

রাস্তার ওপারেই মাঝারি গোছের একটা রেস্তোরাঁ। রং জ্বলে যাওয়া ময়লা ছিটের পর্দা ঝোলানো, গোটা তিনেক ক্যাবিনও আছে। তারি একটা ক্যাবিনে আসন নিলে দুজনে।

—একটা মেনুও নেই এদের!—অসম্ভব আশায় অপূর্ব চোখ বোলাল চারদিকে। ডাকলে, বোয়!—ছেঁড়া হাফপ্যাণ্টপরা বারো তেরো বছরের একটা ছোকরা এসে দাঁড়ালো।

—কী আছে?

—চা-টোস-কেক-হাপবয়েল—মুখস্থ গলায় এক নিশ্বাসে আউড়ে গেল ছেলেটা।

—আমি কিছু খাব না ভাই। এক পেয়ালা চা হলেই যথেষ্ট।

—ডবল ডিমের মামলেট হবে, গরম সিঙাড়া—ছেলেটা অসমাপ্ত তালিকাটা শেষ করলে।

—কিছু দরকার নেই, চা নিয়ে এসো।

—একেবারে কিছুই খাবি না? এতদিন পরে দেখা?—একটা আহত অনুযোগের স্বর ফুটল অপূর্বর স্বরে। প্রতুল ক্লান্তভাবে হাসল: তবে দুটো কেক।

—দুটো বাটার কেক, দু কাপ চা—একবার আউড়ে নিয়ে ছেলেটা অদৃশ্য হল।

—তারপর, কী করছিস আজকাল?—বহুদিন পরে দেখা হওয়া ছাত্রের প্রতি মাস্টারের সস্নেহ প্রশ্নের মতো কোমল একটি জিজ্ঞাসা এগিয়ে দিলে অপূর্ব।

বিদ্রোহ ঘনিয়ে এল প্রতুলের চোখের তারায়।

—ছবি আঁকছি।

—আরে, ছবি আঁকছিস সে তো জানিই। আর্ট স্কুল থেকে দুজনে একসঙ্গে পাশ করলাম, ভুলে গেলি নাকি সে কথা? কিন্তু কী ছবি আঁকছিস?

—যা আঁকতাম।—বিদ্রোহে প্রতুলের চোখ দুটো আবার ঝকঝক করে উঠল।

—মানে?—ঠোঁট থেকে পাইপটা নামিয়ে প্রতুল একটা ছোটমতো হাঁ করল। কার্নিশে-বসা জিজ্ঞাসু কাকের মতো ঠোঁটদুটোকে ছড়িয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

আবছা আবছা ভাবে মনে পড়ছে, এই অপূর্বই না একদিন কবিতা লিখত ? সহপাঠিনী সেই ক্ষীণাঙ্গী শ্যামলী মেয়েটি—প্রাকৃত-ভাষায় অপূর্ব যার নাম দিয়েছিল, 'বনজোসিণি'—যাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিল :

সহকার শাখা উন্মনা হোলো
নব মুকুলের ভারে,
হে বনজ্যোৎস্না নব-কিশলয়ে—

নব-কিশলয়ে—নব-কিশলয়ে! কী যেন তার পরের লাইনটা? কিছুতেই মনে পড়ছে না।

চমক ভাঙল একটা হেঁড়ে গলার আওয়াজে। ঝড়ের ঝাপ্‌টায় প্রজাপতির একটুকরো ছেঁড়া পাখার মতো মিলিয়ে গেল স্বপ্নের অপূর্ব।

বাস্তবের মানুষটি বিরক্তিভরে বললে, কী ভাবছিলি এতক্ষণ? কোনো জবাব দিচ্ছিস না যে?

—কী আর জবাব দেব! ভেবে দেখি।

—হ্যাঁ, ভালো করে ভেবে ছাখ—বলতে বলতে বুকপকেট থেকে মণিব্যাগটা টেনে বের করলে অপূর্ব। চায়ের দোকানের ছোকরা বয়টা একটা ফাটল-ধরা প্লেটে একরাশ মৌরী আর একটুকরো বিল নিয়ে এসেছে। প্রতুলের চোখে পড়ল ব্যাগে এক তাড়া নোট ঠাসাঠাসি করা, তার ভেতর থেকে একটা পাঁচ টাকা অবজ্ঞাভরে তুলে প্লেটের ওপর অপূর্ব সরিয়ে দিলে।

—হ্যাঁ, ভালো করে ভেবে ছাখ—ছেড়ে দেওয়া কথাটাকে আবার ধরল অপূর্ব : পয়সা আছে দস্তুরমতো। আমার তিন চারটে জানাশুনো ভালো ফার্ম আছে, তোকে ইন্‌ট্রোডিউস্‌ করিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ।

—তা ছাড়া—অপূর্ব গলাটা একটু নামিয়ে আনল : আমি আজকাল

সিনেমায় আছি বুঝলি? সেট্-ফেট্ তৈরী করি। চার পাঁচটা ছবিতে কাজও করলাম। তুই কি আমার নাম কখনো দেখিসনি সেলুলয়েডের ওপর?

—আমার ফিল্ম দেখবার সময় হয় না ভাই—প্রতুল যেন ক্ষমা চাইল।

—সে যাই হোক, আমি ওখানেও চেষ্টা করব তোর জন্যে। যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারি, তা হলে আর ভাবতে হবে না। ওখানকার মুরগী সোনার ডিম পাড়ে। অবশ্যি ভালো কোম্পানী হলে।

—ধন্যবাদ।—অসীম ক্লান্তিভরে প্রতুল উঠে দাঁড়ালো। আজকের সকালটাকে অদ্ভুতভাবে ঘোলো করে দিয়েছে অপূর্ব, থল্‌থলে একটা জেলি মাছের মতো যেন লেপটে আছে তার চেতনার ওপরে। নাঃ, আর সহ্য করা যায় না। বললে, আমি চলি ভাই, আমার দেরী হয়ে গেল।

—চল, আমিও যাচ্ছি—বয়টা ভাঙানি নিয়ে ফিরে এসেছে। একটা সিকি তার ওপর রেখে বাকী চেঞ্জগুলো অবহেলাভরে পকেটে ফেলে পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল অপূর্ব।

রাস্তা পার হতে হতে বললে, অয়েল পেন্টিং করবি?

—অর্থাৎ একটি গোলগাল মোটাসোটা লক্ষ্মী-প্যাঁচার ছবি? ভাগ্যবানের পিতৃদেবরূপী কোনো মর্কটের ফোটোগ্রাফ?—প্রতুল তিক্তস্বরে জানতে চাইল।

অপূর্ব চটে উঠল।

—সবটাতেই অত খুঁত বাছতে গেলে চলে না, বুঝলি? চারুকলা একদিন কাঁচকলা খাওয়াবে এই বলে রাখলাম তোকে।—পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে অপূর্ব বললে, এই নে। যদি দরকার বোধ করিস,

দেখা করতে পারিস ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভালো মানুষ, পয়সাও দেবে ভালো।

কার্ডটা এমন করে বাড়িয়ে দিয়েছে যে না নিলে ভদ্রতা থাকে না। রাস্তায় হাতে গুঁজে দেওয়া হ্যাণ্ডবিলের মতো সেটাকে না পড়েই পকেটের মধ্যে ঠেসে দিলে প্রতুল। তারপর সামনের চলন্ত ট্রামটায় লাফিয়ে উঠে বললে, আজ চলি।

পেছন থেকে অপূর্ব বললে, একদিন আসব তোর ওখানে।

বেলা সাড়ে আটটার অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ট্রামে বসে এতক্ষণ পরে প্রতুলের মনে পড়ল একটা কথা। উর্বশীর ছবিটা! হ্যাঁ—হাতেই আছে তখন থেকে, একটুও স্থানচ্যুত হয়নি। অথচ কী আশ্চর্যভাবেই আত্মগোপন করে ছিল! একবারও অপূর্বের চোখে পড়েনি, একবারও ওটা সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি তো!

আগরওয়ালার ফার্ম মুর্গীহাটায়। দুপাশে স্তূপাকার প্যাকিং বাক্সের অন্ধকার ছায়া, আর তামাক পাতার দম আটকানো গন্ধে আড়ষ্ট একটা কাঠের সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে দোতলায় উঠল প্রতুল।

চওড়া একখানা হলঘরের মতো। শাদা ফরাসের ওপর ঢালাও বিছানা। দেওয়ালের গায়ে দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক। মাঝখানে একটা টেলিফোন আর কাঠের বাক্স বয়ে আগরওয়ালা।

—রাম রাম, আস্থন '—আগরওয়ালার সস্নেহ অভ্যর্থনা।

—নমস্কার।—সসম্ভ্রমে জুতোটা খুলে ফরাসের একান্তে আসন নিলে প্রতুল।

—এই সকালে কী মনে করে?—মৃদু হাসিতে জানতে চাইলেন আগরওয়ালা। বেশ বাংলা বলতে পারেন, একটু টান নেই কোথাও। চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা স্বচ্ছ আবরণ, যেন নিজের মধ্যে সব সময়ে মগ্ন হয়ে আছে লোকটা। ফাট্‌কা বাজার—স্পেকুলেশন। অবচেতন মনের মধ্যে সারাক্ষণ ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে : এক হাজার—দো-হাজার—তিন-হাজার—

—সেই ছবিটা এনেছিলাম।

—ওঃ ছবি!—আগরওয়ালা একটা কৃত্রিম কৌতূহল আনতে চাইলেন স্বরে : দেখি।

প্যাকিং খুলল প্রতুল। 'উর্বশী'। তার স্বপ্ন-কামনার মন্থিত রূপ : অনেক নিদ্রাহারা রাতের প্রতিটি প্রহর থেকে ধ্যানের মধু আহরণ করে করে গড়ে তোলা রেখার মধুচক্র। সুধা-বিষের পাত্র বয়ে সাগর থেকে উঠে আসছেন অরুণাভ উষার উষসী। পায়ের তলায় মাথা কুটে কুটে আকুতি জানাচ্ছে নীল নাগের মতো সফেন তরঙ্গ।

ভ্রূ কুঁচকে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন আগরওয়ালা। চোখের ওপর থেকে সরে গেছে তন্ময়তার সেই সূক্ষ্ম আবরণটা। যেন নিপুণ রত্নবিদের মতো পরীক্ষা করছেন একখানা হীরে, কষ্ঠি পাথরে ঘষে যাচাই করে নিচ্ছেন একতাল সোনা।

প্রতুল বসে রইল চুপ করে। মাথার ওপরে ঘূরন্ত পাখার আওয়াজ। সিঁড়ির নিচে থেকে তামাকের দম আটকানো গন্ধটা এখানেও উঠে আসছে। কোথায় ফর ফর করে উড়ে বেড়াচ্ছে একখানা কাগজ—একটা শুকনো শালপাতা নয়তো?

সাঁওতাল পরগণা অনেক দূর; আরো অনেক—অনেক দূর সৃষ্টির আদি-সমুদ্র। নতুন পৃথিবী, নতুন আকাশ—নতুন আলোয় সৌন্দর্যের জন্ম।

—গরীবদাসজী ? এ গরীবদাসজী ?—আগরওয়ালা ডাকলেন।

কোনার দরজা দিয়ে শীর্ণকায় একটি মানুষ ঘরে ঢুকলেন। রোগা কালো রং। শুটকি মাছের মতো শুকনো মুখ। কাঠবেড়ালের কাটা ল্যাজের মতো একটুকরো গোঁফ ঝুলছে নাকের নিচে। আগরওয়ালার ডান হাত। মুখ্য সচিব।

ছবিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে আগরওয়ালা বললেন, চলবে ?

বিচক্ষণ সমঝদারের মতো গরীবদাসজী মাথাটাকে একবার এদিকে, আর একবার ওদিকে হেলালেন। ছবিটাকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন চারদিক থেকে। তারপর উল্টে পেছনটাও একবার দেখে নিলেন, কে বলতে পারে সেখানেও কিছু আছে কিনা!

তারপর অস্পষ্ট স্বরে কী খানিকটা বিড়বিড় করে আউড়ে নিয়ে গরীবদাসজী বললেন, না।

—না ?—আগরওয়ালা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। কমার্শিয়াল আপীল নেই—সিদ্ধান্ত জানালেন গরীবদাসজী।

অদ্ভুত আড়ষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল প্রতুল। যেন এতক্ষণে চমক ভাঙল তার।

—কমার্শিয়াল আপীল ? মানে ?

—মানে, ক্যালেণ্ডারের বেপার তো।—জবাবটা গরীবদাসজীই দিলেন: আর একটু নাঙ্গা নাঙ্গা ভাব থাকলে জমত ভালো!—শুঁটকি মাছের-মতো শুকনো মুখে একটা রসিকতার লোলুপ তৈলাক্ততা ফুটে উঠল।

—ক্যালেণ্ডার! কই, সে কথা তো আমি জানতাম না!—আহত অস্ফুট গলায় বললে প্রতুল।

হা হা করে হেসে উঠলেন আগরওয়ালা। হীরের আংটি

বসানো মোটা অনামিকাটা দিয়ে একটা টোকা মারলেন ফরাসের ওপর।

—আপনি কি ভেবেছেন, ঘরে টাঙিয়ে রাখব? ব্যবসাদার মানুষ মশাই, ওসব বাবুগিরি কি আমাদের পোষায়!

—মাপ করবেন, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল—

প্রায় ছোঁ মেরেই ছবিটা তুলে নিলে প্রতুল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, নমস্কার, আমি আসি—

আগরওয়ালা বললেন, এখুনি? একটু চা—

—না—প্রতুল যাওয়ার জন্যে পা বড়োলো।

—একটু বদলে-টদলে নিয়ে আসবেন, যদি চলে—সহানুভূতিভরে বললেন আগরওয়ালা।

—মাপ করবেন, আর কাউকে দেখুন—

দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল প্রতুল। আরো দ্রুত পায়ে নেমে গেল প্যাকিং বাক্সের অন্ধকার ছায়া ছড়ানো, তামাকের ঝাঁঝে আড়ষ্ট কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে বেয়ে। যেন পালিয়ে এল একটা সীমাহীন আতঙ্ক বয়ে—পালিয়ে এল নরখাদকদের দেশ থেকে।

কমার্শিয়াল আপীল! তাই বটে!

একটা শূন্য অর্থহীন মন নিয়ে পথ চলতে লাগল। এমনিই হবে—এ যেন আগেই মন বুঝতে পেরেছিল। অপূর্বই এনেছিল তার সংকেত। সমস্ত সকালটাকে বর্ণহীন ফিকে করে দিয়েছিল, সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে জড়িয়ে ছিল পিণ্ডাকার একটা জেলিমাছের মতো।

না—না। গলার শিরা দুটো তার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ডান হাতটা মুঠো হয়ে এল কোনো অদৃষ্ট শত্রুর অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। না—হার মানবনা। মার কাছে নয়, অপূর্বর কাছে নয়, ওই আগরওয়ালার

কাছেও নয়। বসন্তের হাওয়া লেগে চিরদিনই শালবনে মুঠো মুঠো শাদা ফাগের মতো শাল ফুল উড়ে যাবে। শুকনো শালপাতার ঠোঙা তার কতটুকু পরিচয়!

পেছন থেকে আচকা একটা মোটরের হর্ণে ধ্যানভঙ্গ হল। কে জানে কখন অন্যমনস্কভাবে ফুটপাথ ছেড়ে নেমে পড়েছিল রাস্তায়। এক পাশে সরে যেতেই চলন্ত মোটরটা বেরিয়ে গেল দেড়হাত দূর দিয়ে। আর—

আর, একটা গর্তের একরাশ জমাট জল উড়ে এল এক পশলা বৃষ্টির মতো, ভিজিয়ে একাকার করে দিলে জামা কাপড়, কপাল, মুখ। সেই সঙ্গে উর্বশীর ছবিটাও। কলঙ্কের মসীলেপে আচ্ছন্ন হয়ে গেল স্বপ্নসঙ্গিনী।

উত্তেজনার মুখে ব্রাউন পেপারটাকে ফেলে এসেছিল আগরওয়ালার ফরাসেই।

## তিন

মাথার রগগুলোর মধ্যে তীরবেগে যেন একরাশ আগুন ছুটে গেল। —এই রোখো, রোখো—পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল প্রতুল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল গাড়িখানার পেছনে, সমস্ত চেতনার মধ্যে এখন শুধু খানিকটা অন্ধ হিংসা আবর্তিত হয়ে উঠেছে। —রোখো—রোখো— আবার সে আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল।

গজ ত্রিশেক দূরে ব্রেক কষল গাড়িটা। পাশ দিয়ে মাথা বার করে পেছনে তাকালো একটি মুখ। কাশীর ষাঁড়ের মতো ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা একটি রক্তিম-গৌর মাংসপিণ্ড। ছবিটা তুলে ধরে প্রতুল এসে দাঁড়ালো।

—দেখেছেন, কী করেছেন?

চর্বির পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চয়ের নেপথ্যে অন্তরীণ—প্রায় অস্পষ্ট দুটি চোখ পিটপিট করে উঠল। মাংসের চাপে রুদ্ধ শ্বাসনলীর ভেতর থেকে অদ্ভুত গলায় আওয়াজ এল: ব্যাপার কী?

—আপনার গাড়ির কাদা ছিটকে ছবিটা আমার নষ্ট হয়ে গেল! আর্তস্বরে স্বরে প্রতুল জবাব দিলে।

—সে কি আমার দোষ? রাস্তায় জল থাকলে মোটরের কাদা ছেটেই। সাবধান হয়ে পথ চলতে শিখবেন।—সংক্ষেপে উপদেশ দিয়েই বৃষমুণ্ডটা আবার গাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল: ড্রাইভার, হাঁকাও।

প্রতুল দাঁড়িয়ে রইল পথের ওপর।

সত্যিই তো—কী বলবার আছে! মোটর তো কাদা ছিটিয়েই পথ চলে চিরকাল। আত্মরক্ষা করেই চলতে হয় সেখানে। অপরাধ যদি কারো থাকে সে তার নিজেরই।

উর্বশী !

উর্বশী মরে গেছে অনেক কাল আগে। মরে গেছে আবছা-গ্যাসের আলো আসা কোনো সংকীর্ণ গলির রুদ্ধশ্বাসে—মিলিয়ে গেছে নোনাধরা দেওয়ালে বৃষ্টির জল চোঁয়ানো সরীসৃপ রেখার অরণ্যে। কোনো এক প্রবাল-বলয়ে ছিল অ্যাটলাণ্টার দেব-দেউল; সামুদ্রিক টাইফুনের উৎক্ষেপে চিরতরে তিরোহিত হয়েছে অ্যাটলাণ্টিকের অতলতায়।

তলা ক্ষয়ে-যাওয়া বাটার চটিজোড়ার কালো কাদা ছিটকে উঠে আরো আবিল করে দিচ্ছে কর্দমাক্ত জামাটাকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ; একটু একটু করে কলঙ্কিত উর্বশীর রং গলে গিয়ে চটচটে করে দিচ্ছে আঙুলগুলোকে।

এই-ই জীবন !

রাত্রির অলস স্বপ্ন। বিনিদ্র প্রহর থেকে কণায় কণায় ধ্যানের মধু আহরণ করে কল্পনার রূপচক্র। না—কিছুই নেই। পায়ের তলায় কালো কাদা আর মাথার ওপর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। উর্বশী মরে গেছে। অপূর্ব। আগরওয়ালা। কমার্শিয়াল আপীল।

—হটো—হটো—হট্ যাইয়ে—

পেছন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়িওলার ধমক। প্রায় গা ঘেঁষে টক টক করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। একটু হলেই চাবুকটা পড়ত পিঠের ওপর। স্পষ্ট নাকে এল ঘোড়ার গা থেকে বৃষ্টি আর ঘামে ভেজা একটা উগ্র কটু গন্ধ। না—এভাবে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকবার অধিকার নেই তার। পথ গাড়ির জন্যে, মোটরের জন্যে, ভাবনা-বিলাসে অলস স্বচ্ছন্দ চারণার জন্যে নয়।

ফুটপাথে উঠে এল। একটা সিগারেট চাই।

পানওলার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। রঙীন অভ্রের ঝালর

আর বড় আয়না দিয়ে সাজানো, বিড়িমুখিনী তরুণীর ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডার। আর তারই এক পাশে—

ম্যাডোনা! হ্যাঁ—ম্যাডোনাই তো।

একটা বাজে নকল, অযত্ন করে ছাপা। তবু ম্যাডোনা। চিরন্তনী মাতৃমূর্তি। অমর শিল্পীর হাতে অপরিসীম মাধুর্য দিয়ে গড়ে তোলা অতুল মাতৃত্ব। সত্যের সঙ্গে সুন্দরের রাখী-বন্ধন—র‍্যাফেলের ম্যাডোনা. ডেল্. গ্র্যাণ্ডুকা!

আর্টের মৃত্যু নেই—জীবনের মৃত্যু নেই। সুন্দর যেখানে সত্যের আলোয় অভিষিক্ত—সেখানে তা চিরঞ্জীব। দেশাতীত—কালাতীত। সে কথা বলে আসছে অজন্তা, ইলোর, বলছে প্যারীর মিউজি দু-লুভ্‌র, ভ্যাটিক্যান মিউজিয়াম—ফ্লোরেন্সের উফিজি গ্যালারী।

হাতের পঙ্কলিপ্ত ভিজে ছবিটা থেকে এখনো রঙ্‌ গলে গলে পড়ছে। বিবর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে উর্বশী। তবু তার পুনর্জন্ম হবে। আবার সে উঠে আসবে অতলের কোনো শয্যাতল থেকে, বিষাক্ত নীল-নাগের মতো সমুদ্র তরঙ্গ মন্থন করে দেখা দেবে কন্যকা উষার মতো। নির্মল—নিষ্কলঙ্ক।

না—আর তার ভয় নেই; সিগারেট কেনা হল না। নিশ্চিত প্রত্যয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল প্রতুল।

* * * *

ঠিক এই সময়ে বাড়িতে একটা বিয়োগান্ত কাণ্ড চলছিল। আর এক ম্যাডোনার আরেক রূপ।

পাওনাদার বিদায় করা যার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। কেউ কেউ দু' কথা শুনিয়ে দেয়—কেউ কেউ বা মনে মনে গজ্‌গজ্‌ করলেও ভদ্রতার খাতিরে দেঁতো হাসি হেসে যায় বাইরে।

—একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন, নইলে এমন করে কাঁহাতক চালাব আমরা।

—হাতে টাকা পেলেই পাঠিয়ে দেব—কষ্ট করে আসতে হবেনা তোমাদের।—বিনীত ভাবে মা প্রতিশ্রুতি দেন।

—সাতবার হেঁটে টাকা পাইনা—বাড়ি বয়ে দিয়ে আসবে!—দূর থেকে কেউ বা অস্ফুট মন্তব্য করে। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে মা শক্ত হয়ে থাকেন।

আজ পাড়ার মুদী নন্দী মশাই এলো একেবারে মরিয়া হয়ে। অনেক ঘুরেছে—আর নয়। এবার এস্পার কি ওস্পার। টাকা যে করে হোক্ আদায় করতেই হবে। ভদ্রতার পালা ঢের হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

পনেরো টাকা মূলধন নিয়ে কারবারে নেমেছিল নন্দী, এখন কুড়ি হাজার টাকার ব্যবসা। উন্নতির এই ইতিহাসটা মসৃণ নয়। তিরিশ বছরে অনেক রকম মানুষ দেখেছে সে—সঞ্চয় করেছে সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা। টাকা কী করে আদায় করতে হয় তা তার অজানা নেই। সুতরাং বেশ নম্র ভণিতা দিয়েই আরম্ভ করল নন্দী।

—অনেক আমার বাকী পড়ে গেছে মা। বিরাশী টাকা সাড়ে বারো আনা।

শঙ্কিত গলায় মা বললেন, জানি।

নন্দী সবিনয়ে হাসল: জানবেন বৈ কি, জানারই তো কথা। তা ওটা কি আজ পাব?

—আজ তো হাতে টাকা নেই। দু-চারদিনের মধ্যেই সব মিটিয়ে দেব আপনার—মা সভয়ে জানালেন।

—দু চারদিনের নাম করে তো দুমাস কেটে গেল। আর নরতে

পারি না মা।—জুটো সোনাবাঁধানো দাঁত বের করে আবার বিনীত হাসি হাসল নন্দী : আজ টাকা কটা ফেলে দিন।

—ঘরে টাকা থাকলে কি আর দিতাম না আপনাকে ?

—আছে, আছে, টাকা আছে। নম্র স্বরে নন্দী বললে, আপনার সোনার সংসার—টাকার অভাব কী ? হাত ঝাড়া দিলেই দু-শো একশো ঝরে পড়ে। গরীবকে আর ঘোরাবেন না—বিদায় করে দিন।

—বিশ্বাস করুন, সত্যিই টাকা নেই।—মা অসহায় কণ্ঠে জবাব দিলেন।

—বিশ্বাস তো এতকাল করেই আসছি, কিন্তু কাঁহাতক পারা যায় আর ? আমারও তো এই করেই চালাতে হবে।—নন্দী এবার হাসল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত জুটো চকচক করে উঠল শেয়ালের হাসির মতো।

আত্মরক্ষার জন্যে যেন আকাশে হাত বাড়িয়ে একটা অবলম্বন খুঁজতে লাগলেন মা : প্রতুল একটা ছবি বেচতে গেছে। যদি পারে, তবে আজই অপনার সব টাকা মিটিয়ে দেব নন্দী মশাই। একটা পাই পয়সা অবধি বাকী থাকবে না।

—কী বললেন, ছবি বেচতে গেছে !—হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল নন্দী মশাই : ছবি বেচে দোকান-বাকী শোধ করবে আপনার ছেলে ! এ যে ঠাকরুণ তেঁতুল-বিচির গল্প শোনাচ্ছেন !

কী একটা কথা বলতে গিয়ে মার ঠোঁট জুটো একবার কেঁপে উঠল, কিন্তু কোনো শব্দ বেরুল না। নন্দী হঠাৎ হাতের ছাতাটা রেখে সামনের সিঁড়িটার ওপরেই বসে পড়ল।

—তা তেঁতুল বেচেই যদি টাকা নিতে হয়, তাহলে বিচি থেকে গাছ না গজানো পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করা যাক্।

—মতলব কী আপনার ?—সন্দিগ্ধভাবে মা প্রশ্ন করলেন ।

—মতলব আর কী থাকবে ? টাকাটা না পেলে তো আমার চলবে না । এই দোর গোড়াতেই বসি । দেখি, কোনো ব্যবস্থা হয় কিনা ।

—সে কি কথা !

—কী আর করা যায় ?—সাদা দাঁত থেকে সোনার ঝলক বিতরণ করে নন্দী বললে, হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলে স্বয়ং তারকেশ্বর অবধি তুষ্ট হন—আর মোটে বিরাশী টাকা সাড়ে বারো আনা পাওয়া যাবে না! এও কি একটা কাজের কথা হল ?

আতস্বরে মা বললেন, মিনতি করে বলছি নন্দী মশাই, এ বেলা আপনি যান। প্রতুল টাকা পেলে আপনার দেনাই সকলের আগে চুকিয়ে দেব ।

—বেশ তো, আমি না হয় বসেই থাকি । টাকা নিয়েই উঠব একবারে ।

—কিন্তু যদি দুদিন দেরী হয় ?

—না হয় দুদিন হত্যে দেব । আমার অভ্যেস আছে মা । তারকেশ্বরে সাতদিন এক নাগারে ধর্ণা দিয়েছিলাম একবার—মৃদু হেসে নন্দী ছাতার বাঁটটা ঠুকতে লাগল সিঁড়ির ওপর ।

ততক্ষণে গলির ভেতরে লোক জড়ো হতে শুরু করেছে ।

—ব্যাপার কী নন্দী মশাই, অমন করে সিঁড়ির ওপর বসে যে !

—হত্যে দিচ্ছি—নন্দী সংক্ষেপে জবাব দিলে ।

—হত্যে দিচ্ছেন ? কেন ?—কৌতূহলী প্রশ্ন এল ।

—বিরাশী টাকা সাড়ে বারো আনার জন্যে । দেখি কতদিনে কপাল ফেরে ।

জনতার মধ্যে একটা হাসির রোল রোল উঠল।

—ঠায় বসে থাকবেন ?

—এক পা নড়ব না।—নন্দী আবার ছাতার বাঁটটা ঠুকতে লাগল সিঁড়ির ওপরে।

জনতার মধ্য থেকে সকৌতুক প্রশ্ন এল : আর খাওয়া দাওয়া ?

—বামুন বাড়ির দোরে যখন বস্‌ছি, তখন কি আর চারটি প্রসাদ পাব না ?—নন্দী হাসতে লাগল তৃপ্তভাবে।

—তা ভালো। টাকা না পান, প্রসাদে পুষিয়ে নেবেন—উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে একদল লোক বিদায় নিলে। লজ্জায় অপমানে মা পাথর হয়ে রইলেন। আর নয়—যথেষ্ট হয়েছে। এরপরে মাত্র দুটি উপায় আছে হাতে। হয় আত্মহত্যা করা—নইলে রাত্রির অন্ধকারে যে করে হোক্ যেদিকে খুশি পালিয়ে যাওয়া। এত বড় অপমানও জীবনে সহ্য করতে হবে—এ তিনি কোনদিন কল্পনাও করেন নি।

সিঁড়িতে বসে প্রসন্ন মুখে একটা বিড়ি ধরালো নন্দী। চমৎকার অহিংস রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মহাত্মা গান্ধী। অত বড় ব্রিটিশ রাজ্যকেই কাহিল করে দিলেন—তা এতো মাত্র বিরাশী টাকা সাড়ে বারো আনা। আত্মসম্মান বাঁচাতে হলে ঘর-বাড়ি বন্ধক দিয়েও টাকা মিটিয়ে দেবে প্রতুল।

মা শেষ চেষ্টা করলেন : নন্দী মশাই !

—আপনি নিজের কাজে যান—আমি বেশ আছি।—নন্দী বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল।

আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরল প্রতুল।

—এ কী কাণ্ড !

এতক্ষণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে মা হু হু করে কেঁদে ফেললেন : আমাকে

এখান থেকে কোথাও পাঠিয়ে দাও প্রতুল—নইলে গঙ্গায় ডুবে মরব। এ অপমান আর সইতে পারব না।

পাথরের মতো শক্ত মুখে প্রতুল বললে, আপনি চলে যান নন্দী মশাই। আজকের মধ্যেই যে করে হোক—টাকা আপনার শোধ করে দেব।

—টাকা না পেলে আমি এখান থেকে উঠব না।—নিস্পৃহ শান্ত গলায় জবাব দিলে নন্দী।

—যাবেন না আপনি ?

—না।

—আমার কথায় বিশ্বাস করেন না ?

—ছ মাস বিশ্বাস করেছি—আর কত করব ?—বাঁকা হাসিতে নন্দীর ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে উঠল : বিশ্বাস দিয়ে আমার কোনো লাভ নেই—আমি টাকা চাই।

—আজকের দিনটা আমায় সময় দিন।

—আজ, কাল—যে ক'দিন খুশি সময় নিন আপনি। মোদ্দা টাকা না পেলে সিঁড়ি থেকে আমি উঠছি না।

—কিন্তু উঠতেই হবে আপনাকে—প্রতুলের চোখে আসন্ন দুর্যোগের সংকেত দেখা দিল।

—আমি উঠব না। নিরাসক্ত জবাব দিলে নন্দী!

মাথার মধ্যে আবার তীরের মতো ধারায় ছুটে গেল রক্ত। সমস্ত শরীর জলে গেল একটা অসহ্য বিষ-ক্রিয়ায়। তার উর্বশীর বিরুদ্ধে আজ সমস্ত পৃথিবী চক্রান্ত করেছে—গলা টিপে হত্যা করতে চাইছে তার সত্য-সুন্দরকে। অপূর্ব। আগরওয়ালা। মোটরের কাদা। কাশীর ষাঁড়ের মতো চর্বি চিক্কণ একখানা অতিকায় মুখ।

দু-হাতে নন্দীর ঘাড় ধরে সজোরে রাস্তার দিকে ঠেলে দিলে প্রতুল।

আকস্মিক আক্রমণের জন্যে নন্দী তৈরী ছিল না—সোজা গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন তার দাঁত দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে ; চোখ দুটো দপ্ দপ্ করছে একটা অমানুষিক জিঘাংসায়।

একটা বন্য জন্তুর মতো কিছুক্ষণ ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস ছাড়ল নন্দী। হাতের ছাতাটা ঠুকল রাস্তার ওপর। তারপর চীৎকার করে উঠল।

—আচ্ছা, দেখে নেব। রাস্তায় বেরুবে না শালা ? গলায় গামছা দিয়ে ড্রেনের জল খাইয়ে টাকা আদায় করব, তবে আমার নাম গঙ্গারাম নন্দী।

মুহূর্তে আবার লোক জড়ো হয়ে গেছে।

—ব্যাপার কী নন্দী মশাই—কী হল ?

—ব্যাপার ?—অশ্লীল ভাষায় একটা গাল দিয়ে নন্দী সমানে চীৎকার করে চলল, ধার করে খাওয়ার সময় লজ্জা করে না, টাকা চাইলে গায়ে হাত ? অমন ফোতো নবাব আমি অনেক দেখেছি। দেখি, কোন্ শালা টাকা না দিয়ে—

প্রতুল সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

মা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে এখন আর জল নেই। শুধু রক্ত ঠিকরে পড়ছে সে চোখ থেকে।

—কালই আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। ব্যবস্থা করে দিয়ো বাবা।—কোনো জবাব পাওয়ার আগেই মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠায় দাঁড়িয়ে রইল প্রতুল। সব দোষ তার। তারই অপরাধে আজ মার এই লাঞ্ছনা। হ্যাঁ—ঠিকই বলেছিল অপূর্ব। জীবন আজ মোটরের চাকায় ছিটকে-ওঠা কালো কাদায় ক্লেদাক্ত হয়ে গেছে। কে চায় আর্ট ? আনন্দের ধ্যানে নিঃশেষে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার সুযোগ কই মানুষের—কোথায় তার আকাশ ?

হাতের ভেতর রং গলে যাওয়া উর্বশীর ছবিটা মোড়া রয়েছে এখনো। একটা বিষাক্ত সাপ মনে হল সেটাকে—সজোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ছবিটা। উর্বশীর মৃত্যু হয়েছে কল্পনার কোনো গজদন্তী মিনারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে; অ্যাট্‌লাণ্টা হারিয়ে গেছে অ্যাট্‌লান্টিকের অতল জলধারার আড়ালে।

কোথায় ভেলাথ্‌কেথের ভেনাস্ অ্যাণ্ড কিউপিড্? তার জায়গা জুড়েছে টনিকের বিজ্ঞাপন, দা ভিঞ্চির মোনা লিসার হাসি মিলিয়ে গেছে কেশতৈলের চারুচিত্রে; টিশিয়ানের ভেনাস আজ বিদেশী প্রসাধনের পশরা সাজিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, রেমব্রাণ্টের শাস্‌কিয়া শোভা পাচ্ছে বিলিতী সিগারেটের টিন হাতে। ম্যাডোনা-ডেল-গ্রাণ্ডুকা? তার জন্যে আছে শিশুর খাদ্য—বোতলের আর কৌটোর দুধ।

কমার্শিয়াল অ্যাপীল! তাই বটে!

গায়ের জামাটা খুলবার উপক্রম করতেই পকেটে শক্ত একটা কাগজের টুকরোর মতো কী ঠেকল। কী এটা?

একখানা কার্ড। বিদায়ের আগে অপূর্ব হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ বুলিয়ে গেল প্রতুল:

রায় ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর
জমিদার এ্যাণ্ড্ মার্চেণ্ট
—নং একডালিয়া রোড্
বালিগঞ্জ।

—চার—

রায় ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুরের বাড়ির ওপাশের ফুটপাথে প্রায় দশ মিনিট সে দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে। কাল সমস্ত রাত নিজের সঙ্গে তার বিরোধ চলেছে। তার দ্বিতীয় সত্তা কৌতুকভরা মুখে বার বার জিজ্ঞাসা করেছে, তারপর? তারপর? এই সবে শুরু—এর শেষ কোথায়?

সাধনা—শিল্প! রঙীন্ ফানুস। ঘূর্ণি উঠবে এক একটা করে আর টুকরো টুকরো হয়ে মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়! শুধু একটি মাত্র উপায় আছে। পালিয়ে যাও—পালিয়ে যাও এখান থেকে। ডাক শোনো ইংরেজ কবি ডি এইচ্ লরেন্সের। দক্ষিণ সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস। প্রবাল দ্বীপে নারিকেল বীথি মর্মরিত কোনো নিভৃত কুঞ্জে চান্দ্র-রাত্রির অভিসার। 'মালা অব্ দ্য সেভেন সীজ'। পালিয়ে যাও সেখানে। গগ্যাঁর মতো ঘটুক পরিপূর্ণ আত্মলুপ্তি।

আর না হলে? দিনের পর দিন প্রেতের মতো পৃথিবী তোমাকে তাড়া করে ফিরবে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো কোথাও তোমার স্থান হবে না—চারদিক থেকে প্রবল কণ্ঠে উঠবে তোমার অস্বীকৃতি, কবি-শিল্পী উইলিয়াম ব্লেকের মতো দশ শিলিংয়ের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হবে। আর নইলে ভ্যান্ গগের মতো অভিশপ্ত হয়ে দিনের পর দিন আঘাত সয়ে যেতে হবে বুকের ওপর; ভ্যান্ গগের মতোই চারদিকের অন্ধকার কালো ছায়া নিবিয়ে দেবে তোমার সূর্যকে: "The yellow house of light!" তারপর? তারপর নিজের পেটের মধ্যে একটা বুলেট্ চালিয়ে—পুরানো পাইপে একটা শেষ টান দিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে।

হয় গগ্যাঁর মতো পালিয়ে যাও, নইলে ভ্যান্ গগের মতো তিলে তিলে বিষ পান করো। এই জীবন—এই আর্টের পরিণাম।

কাল সমস্ত রাত তার মাথার মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেছে। যেন অসংখ্য বিষাক্ত কাঁটার আঘাত এসে বিঁধেছে তার মস্তিষ্কে। যন্ত্রণা: অসহ্য যন্ত্রণা! টিশিয়ানের ছবি মনে পড়ে: কাঁটার মুকুটপরা খ্রীস্টের সেই ভয়াবহ বর্ণলিপি। জীবনের প্রতীক—আদর্শের প্রতীক—স্বপ্নের অবসান।

তা হলে তাই হোক। পোর্ট্রে´টই সে আঁকবে। গঁগ্যার মত পালাতে পারবে না—ভ্যান্ গগের মতো পাগল হয়ে যেতে সে রাজী নয়। অপূর্বর কথাই ঠিক। চুলোয় যাক ব্লেকের "Imagination, Inspiration, Passion!" মৃত্যু হোক সমুদ্র থেকে উঠে আসা অনন্ত যৌবনা উর্বশীর; নীলোর্মির লীলা-বিস্তারে শুক্তির পদ্মলেখায় 'বটিচেল্লি'র যে কুন্দ-শুভ্র নগ্নিকা ভেনাসের আবির্ভাব হল—পাতালের অন্ধকারেই সে তলিয়ে যাক।

পোর্ট্রে´টই আঁকবে! কে জানে—তার মধ্য থেকেও কোনো সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে কি না! হয়তো ব্যক্তিপরিচয় মুছে গিয়ে তার ভেতর থেকেও চিরন্তন আর্ট জন্ম নেবে। কে বলতে পারে দেখা দেবে না নতুন কোনো মোনা লিসা—ভেলাস্কেথের কোনো ইন্‌ফ্যান্টা মার্গারিটা!

কিন্তু রাত যখন ভোর হয়েছে, গলির মোড়ের গ্যাসটা যখন ম্লান হয়ে এসেছে যেন কশাইখানার কোনো নিহত পশুর চোখ—তখন রাতের ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেছে একরাশ জমাট কুয়াশার মতো।

মাথাটা একেবারে ফাঁকা। যেন কোথাও দাঁড়িয়ে নেই সে, একটা অদৃশ্য সুতোর বন্ধনে শূন্যে ঝুলছে ত্রিশঙ্কুর মতো। তার উর্বশী—তার

আফ্রোদিতি! সমুদ্রের ফেনায় ফেনায় শুক্তিকমলে আর ভেসে আসবে না রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন—বটিচেল্লির কল্প-কামনা।

তারপরেই পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেছে। মা উঠেছেন। হঠাৎ একটা অবর্ণনীয় ভয়ে যেন সারা শরীর হিম হয়ে গেছে তার। না—তাকাতে পারবে না মার চোখের দিকে। দোরগোড়ায় এখনো নন্দী মশাই দাঁড়িয়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে প্রতুল। দশটা পর্যন্ত ঘুরেছে পথে পথে, পার্কে পার্কে। জীবন! ম্যাডোনা-ডেল গ্র্যাণ্ডুকা কোথাও নেই। মার চোখেও না!

এক কাপ চা পর্যন্ত খায়নি—সারা শরীরে স্তিমিত অবসাদ। কিন্তু চা এলেই কি খেতে পারত? বিষের মতো তেতো মনে হত নিশ্চয়।

রোমান্টিক্? তাই। অপূর্ব তাই বলবে, পৃথিবী তাই বলবে, মাও তাই বলবেন। কিন্তু এই রোমান্স নিয়েই তো সে বেঁচে ছিল এতকাল। কিন্তু আজ দেখা গেল পায়ের নিচের মাটিটা চোরাবালি, আজকের আকাশ কৃষ্ণপক্ষের নিশি-নিকষের মতো কালো।

কিন্তু ফুটপাথের এপারে দাঁড়িয়ে এভাবে আর মনোমন্থন করা চলেনা। এবার যা হোক একটা কিছু করে ফেলা যাক। সিগ্‌নাল-নামা রেল-লাইনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মানুষ অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে পারে; তারপর যখন ঝড়ের বেগে ট্রেন এগিয়ে আসে, তখন তার সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে কতক্ষণ লাগে আর?

বড় বড় পায়ে সে এগিয়ে গেল রাস্তা পার হয়ে; তেমনি দ্রুত উঠে গেল পর পর চারখানা সিঁড়ি; তারও পরে শরীরের সমস্ত শক্তি আঙুলের মাথায় এনে প্রাণপণে টিপে ধরলে কলিং বেলের বোতামটা।

দরজা খুলল। উর্দিপরা একটা বেয়ারা। অভ্যস্ত রীতিতে পা থেকে

মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলে প্রতুলের। ঘাড়ের পাশ দিয়ে পেছনে দৃষ্টি চালিয়ে যেন দেখতে চাইল সঙ্গে গাড়িও সে এনেছে কিনা।

—কী চাই ?

'চান' বল্‌ল না। যতক্ষণ সম্পূর্ণ পরিচয়টা না পায়, ততক্ষণ ভাববাচ্য রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—ব্রজেনবাবু আছেন ?

—আছেন। নাম ?

—নাম ?

—হ্যাঁ—কার্ড।

ও, কার্ড। হাঁ—এ অঞ্চলে এই-ই রেওয়াজ বটে। পকেট থেকে নোটবুক বের করল, ফাউণ্টেন পেন দিয়ে গোটা গোটা হরফে লিখল নিজের নাম—পরিচয় লিখল : আর্টিস্ট। তারপর বেয়ারাটার নিরাসক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আভিজাত্যবোধের একটা দুর্বল অহমিকা অনুভব করল। নিবটাকে সোজা করে ধরে মোটা মোটা টানে অ্যাল্‌ফাবেটে লিখল : গোল্ড মেডালিস্ট্।

কাগজের টুকরো নিয়ে বেয়ারা অন্তর্ধান করল।

রুমাল দিয়ে একবার কপালটা মুছল প্রতুল। সময় আছে এখনো।

এখনো সে ছুটে পালাতে পারে এখান থেকে—একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পার হয়ে যেতে পারে অনেকখানি পথ। পারে। বেয়ারাটা ফিরে আসার আগেই পারে। শেষ চেষ্টা করতে পারে তার উর্বশীকে বাঁচোবার।

কিন্তু !

পালাতে পারল না। যেখানে ছিল সেইখানেই রইল দাঁড়িয়ে। উচ্চকিত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে লাগল রাজপথ দিয়ে বয়ে যাওয়া

ট্রাফিকের গতি-স্পন্দন—নাসারন্ধ্রে টেনে নিতে লাগল পোড়া পেট্রোলের গন্ধ!

সামনের দরজাটা আবার খুলে গেল। সেই বেয়ারা। অনুভূতিহীন মুখে একটুকরো আপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে বললে, আসুন।

বেশি দূর যেতে হল না।

একটা ছোট করিডোর পেরিয়েই বসবার ঘর। সেই ঘরেই ছিলেন রায় ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুর। কাশ্মীরি অ্যাশ্‌ট্রেতে পুড়ছিল চুরুট। পাশের সোফায় বসে গৃহস্বামী একখানা খবরের কাগজের মধ্যে তলিয়ে ছিলেন।

দোরগোড়ায় প্রতুল থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

বেয়ারা ডাকলে, হুজুর?

—উঁ?—কাগজ থেকে মুখ না তুলেই ভদ্রলোক সাড়া দিলেন।

—এসেছেন।

—ওঃ!—ত্রস্তভাবে ব্রজেনবাবু নামিয়ে ফেললেন খবরের কাগজখানা; দেখা গেল আবহাওয়া ভীতিকর হলেও লোকটি তেমন ভীতিপ্রদ নয়। চশমাপরা গোল মুখে একরাশ প্রসন্ন হাসি। বয়েস পঞ্চাশের কিছু ওপরে। মাথার আধখানা জুড়ে একটি মসৃণ টাকের বিস্তার। পরিতৃপ্তির একটা স্তরে পৌঁছে মানুষ যে প্রশান্তি লাভ করে—ভদ্রলোকের চোখে-মুখে তারই একটি সুচারু অভিব্যক্তি।

—নমস্কার। আপনিই আর্টিস্ট প্রতুল চাটার্জি?

নীরব নমস্কারে নির্বাক সম্মতি জানিয়ে মাথা হেলাল প্রতুল।

—আসুন—আসুন—বসুন।

পুরু কার্পেটের ওপর অস্বস্তিভরা পা ফেলে এগিয়ে এল প্রতুল। এই আর একদল। আগরওয়ালাদের আর একটি ছদ্মবেশ। পয়সা দিয়ে

আর্টিস্ট রেখে শিল্পের পেট্রন হওয়ার দাবী জানায়, আর্ট একজিবিশনে গিয়ে দাম দেখে ছবি কেনে—টাকার অঙ্কটা যেখানে মোটা সেইখানেই আকৃষ্ট হয় এরা ; বিলিতী বই পড়ে বোঝে অবনী ঠাকুরের আর্ট—অ্যামেরিকানদের প্রশংসা শুনে কেনে যামিনী রায়ের ছবি। সমাজের কাচের জারে জিইয়ে রাখা যেন একদল রঙীন মাছ এরা।

নিজের ভেতর একটা উদ্ধত বিদ্রোহ নিয়েই এগিয়ে এল প্রতুল—আসন নিলে।

—আমার কাছে কী প্রয়োজনে এসেছেন আপনি?—চশমার আড়ালে স্বাচ্ছন্দ্যের ঘোর-লাগা প্রায় ঘুমন্ত দুটি চোখের সস্নেহ দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করলেন ব্রজেনবাবু।

বলতে ইচ্ছে করল, কার্টুন আঁকতে এসেছি। উড্‌হাউসের গল্প পড়ে অভিজাত-সমাজ থেকে সংগ্রহ করতে এসেছি কাভিনাও দি ফ্রগ্‌কে—কিন্তু দুর্বিনয়টাকে সামলে নিলে সে। চাকরির উমেদারি করতে এসে ওভাবে খোঁচা দেবার অধিকার নেই তার। অন্তত লোকায়ত দর্শনের রীতি তা নয়।

পরাভূত গলায় জবাব দিলে, আমাকে অপূর্ব সেনগুপ্ত পাঠিয়েছে।

—অপূর্ব? তাই বলুন! আমিই ওর কাছে ভালো একজন আর্টিস্টের কথা বলেছিলাম। সেইজন্যেই কি আপনি এসেছেন?

নইলে কি বেলা দশটা পর্যন্ত এক কাপ চা-ও না খেয়ে এখানে খোস-গল্প করতে? তিক্ত উত্তরটা এবারেও সামলে নিতে হল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—বেশ, বেশ, ভারী খুশি হলাম। একটু চা খাবেন তো?

চা! এক কাপ চায়ের জন্যে সমস্ত শরীরটা ছট্‌ফট্ করছে। কিন্তু না, এত সহজেই এদের লোভের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। এই মুহূর্ত

থেকেই নিজের সঙ্গে লড়াই শুরু করতে হবে তাকে। চাপা কঠিন ঠোঁটে প্রতুল বললে, না, ধন্যবাদ। এই মাত্র খেয়ে এসেছি।

—আপনি কি এখুনি রেডি আছেন?

—না থাকলে আপনার কাছে আসব কেন?—অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিক্ত মন্তব্যটা এবার বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল এর পর এখানে বসে থাকাটা অর্থহীন। চাকরীর উমেদারীর ওপর এখানেই তার যবনিকা পড়ল তাহলে।

কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্রজেনবাবু ব্যাখ্যা করলেন জিনিসটা।

—তাতো বটেই। তাতো বটেই। সম্পূর্ণ ঠিক কথা।

একেই কি বলে আভিজাত্য? সুরুচি? না এর নাম অনুকম্পা? তাকে কি এতই নগণ্য মনে করেন ব্রজেনবাবু, যে তার ওপর রাগ করতেও তাঁর সম্ভ্রমে বাধে? প্রতুলের কান লাল হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে ব্রজেনবাবু তাকে অপমান করলেই যেন সে সুখী হয়—স্বীকৃত হয় তার নিজের মূল্য। প্রমাণিত হয় তার স্বাতন্ত্র্যের দাবী।

ব্রজেনবাবু জানালেন, আমারই পোর্ট্রেট আঁকতে হবে। আর আমার স্ত্রীর মর্জি হলে—তাঁরও।

—ওঃ।

ব্রজেনবাবু অ্যাশ্‌ট্রে থেকে তুলে নিলেন চুরুটটা—নিঃশব্দে ধূমপান করলেন খানিকক্ষণ। আর এই নিঃশব্দতার অবকাশে পায়ের তলার কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে রইল প্রতুল। ভালো কাশ্মীরি কাজ—রঙ-বেরঙের বিচিত্র কারুকার্যে খচিত একরাশ ফুটন্ত গোলাপ। কোন্ অজ্ঞাত গ্রাম্যশিল্পীর কত নিবিড় সৌন্দর্য পিপাসা ওদের ভেতরে রূপায়িত হয়েছে কে জানে। তারও কত বিনিদ্র রাত্রির ধ্যানে গোলাপের প্রত্যেকটি পাপড়িকে রঙীন করে তুলেছে কে বলতে পারে। আর

এখানে ? এদের ওপরে জমছে হৃদয়হীন নাগরিক জুতোর ধূলো—অবশ্য বিলিতী দোকানের জুতোর। দামী হিলে নামী কোম্পানির লেবেল্।

ব্রজেনবাবু বললেন, কিন্তু একটা মুশকিল হল যে।

প্রতুল মাথা তুলে ভাষাহীন চোখে তাকালো। যাক বাঁচা গেল। চাকরিটা তা হলে আর জুটল না শেষ পর্যন্ত।

—আপনি বাইরে যেতে রাজী আছেন ?

—কোথায় ?

—Say, কাশিয়াং ?

—কাশিয়াং ? কেন ?

—আমরা সবাই যাচ্ছি। রিজার্ভেশন হয়ে গেছে পরশুর। মাস দুয়েক থাকা হবে ওখানে। আপনিও চলুন না।

—তারপর ?—অনিচ্ছাসত্ত্বেও তির্যকভাবে জিজ্ঞাসা করে ফেলল প্রতুল।

—তারপর আর কী ?—পরিতৃপ্ত মানুষের প্রসন্ন হাসিতে উৎসারিত হয়ে গেলেন ব্রজেনবাবুঃ থাকবেন আমাদের সঙ্গে। ছবি আঁকবেন। রাজী ?

এই শেষ সুযোগ। পালাতে পারা যায় এখনো। অ্যাডোনিস্, তোমার সামনে বন্য বরাহ ছুটে আসছে। পেছনে ভেনাসের নিষেধ। মৃত্যু, মৃত্যু আসছে। বুকের রক্তে রাঙা হয়ে যাবে মাটি। অ্যাডোনিস্ ফিরতে পারো এখনো, এখনো বাঁচতে পারো।

কিন্তু !

মা। অপূর্ব। আগরওয়ালা। নন্দীমশাই। জীবন। ভ্যান্ গগ—

—রাজী।

সংক্ষিপ্ত শব্দটুকু উচ্চারণ করেও অনেকক্ষণ ধরে প্রতুলের ঠোঁট দুটো

কাঁপতে লাগল। যেন আরো অনেক কিছু তার বলবার ছিল—বলতে পারল না।

মসৃণ টাক আর গোল মুখখানা জ্বলজ্বল করতে লাগল খুশিতে।

—বেশ, বেশ। আর্টিস্ট্ মানুষ—পথের সব চেয়ে ভালো কম্প্যানিয়ান —ব্রজেনবাবু হঠাৎ প্রগল্ভ হয়ে উঠলেন: তা ছাড়া ওখানে নিরিবিলিতে আপনার ছবিও জমবে ভালো।—চুরুটে একটা টান দিলেন: নিজের পোর্ট্রেট নিজেই আঁকিয়ে রাখি মশাই—ভবিষ্যতে কেউ যে করবে সে ভরসা তো আর নেই।

একটা অহেতুক উৎকট অট্টহাসিতে ঘরখানাকে ভরিয়ে দিলেন।

আফ্রোদিতে সাইপ্রিন! চিরদিনের মতো সিথেরিয়ার সমুদ্রে ডুবে যাও তুমি। ভলক্যানের কদর্য বাহু এগিয়ে আসছে তোমার দিকে!

মা বললেন, ভালোই তো, যাও।

—কিন্তু তোমাকে এখানে একা ফেলে যাব? দেখবে কে?

মা হাসলেন। দুদিন পরে এই প্রথম হাসলেন।

—তোমার বাবা যখন মারা যান, তখন তোমার বয়েস ছিল আট বছর। তারপর ষোল বছর ধরে তোমাকেই আমায় দেখতে হয়েছে—আমাকে তুমি দেখোনি।

ঠিক কথা—সে আত্মপ্রত্যয় মার আছে। মার চোয়ালদুটো একটু উঁচু, মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি ধারালো। রাণী এলিজাবেথের ছবির মতো 'বট্লনেক'—গলা থেকে কাঁধ পর্যন্ত কোনো ভাঁজ পড়েনি—নেমে এসেছে বঙ্কিম ললিত রেখায়। আত্মপ্রত্যয়। ব্যক্তিত্ব। একটু অহমিকাও।

—কিন্তু তবু তোমার কষ্ট হবে—

—কিছু হবেনা, তুমি ঘুরে এসো। সংসারের অভাব যদি মেটে, তা হলে এক-আধটু অসুবিধে এমন বড় কথা নয়। পাশের বাড়ির ললিতবাবুরা তো আছেনই—দরকার মতো ওঁরাই দেখা-শুনা করবেন

এর পরে আর দ্বিধা করার প্রশ্ন উঠে না। সংসারের অভাব! তাই বটে। স্নেহের চাইতে ওদিকের পাল্লা আজ অনেক বেশি ভারী।

সংকুচিত গলায় প্রতুল বললে, নন্দী মশাইয়ের টাকাটা আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব।

অন্য সময় হলে এর মধ্যে হয়তো অভিমানের রেশ ধরা পড়ত মার কানে। কিন্তু আজ পড়লনা।

—বেশ, তাই দিয়ো।

তারও দুদিন পরে। মাকে প্রণাম করে, কুলির মাথায় দুটো বড় বড় সুটকেস্ আর একটা বিছানা চাপিয়ে প্রতুল যখন শিয়ালদা পৌঁছুল, তখন গেটের কাছে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্রজেনবাবু।

—আপনার পথ চেয়েই আছি।

—ধন্যবাদ।—শুকনো গলায় জবাব দিলে।

—এত দেরি করলেন যে? ভাবলাম, আপনি আর আসবেনই না। ভারি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম।

—কিন্তু আরো তো মিনিট দশেক দেরি। তা ছাড়া রিজার্ভেশন রয়েছে!

—তা হোক, তা হোক। একটু আগে-ভাগে তো আসতে হয়! নিন—চলুন—

চার বার্থের একটি ফার্স্ট ক্লাশ কামরা। মেজেতে স্তূপাকার লগেজ।

একটি চাকর আর সেই বেয়ারাটি টানাটানি করে সেগুলো গোছাবার চেষ্টা করছে।

কামরার মধ্যে দুটি মহিলা। জানালা ঘরে বাইরে দাঁড়িয়ে পাঁচ সাতজন। ঝকঝকে তকতকে। সী অফ্ করতে এসেছে।

—আমার স্ত্রী—মিসেস্ চৌধুরী। আমার মেয়ে নীরা। আর ইনি আর্টিস্ট্ প্রতুল চাটার্জি—গর্বের একটা সুর গলায় এনে ব্রজেনবাবু পরিচয় পর্ব শেষ করলেন: গোল্ড্ মেডালিস্ট্। যারা সী অফ্ করতে এসেছিল—কৌতূহলের আলো চিক চিক করতে লাগল তাদের চোখে। কামরার মহিলা দুটি প্রতুলকে নমস্কার জানালেন।

শাড়ীতে গয়নায় আড়ষ্ট—স্থূলাঙ্গী মধ্যবয়সী একজন। মা। আর গাঢ় রক্ত রঙের শাড়ীতে বছর কুড়ির একটি তরুণী—মেয়ে। শিখার মতো তীক্ষ্ণ রূপের আলোয় জ্বলছে মেয়েটি; দুই গালে কর্ণাভরণের রক্ত প্রবাল থেকে একটা নিষ্ঠুর দীপ্তি পড়েছে, অধর-ওষ্ঠের সঙ্গমে বাঁ গালে বড় একটি কালো তিল, ঘন-পক্ষ্ম চোখের তারায় একটা উগ্র পিঙ্গল-আভা। জুনো? হেরা?

মুহূর্তের মধ্যে প্রতুলের মনে হল সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

## —পাঁচ—

ওপরে ডাউ হিল, নিচে কাশিয়াং স্টেশন। মাঝামাঝি জায়গায় বাড়িটা।

মেঘ আর কুয়াশার ভিড় না থাকলে সামনে ঝলমল করে ওঠে কাঞ্চন-জঙ্ঘা। স্বর্ণশিখর। অপরাজেয় হিমালয়ের আর একটি উদ্ধত কৌতুক। বাড়ির সামনের ছোট লনটা যেখানে সীমিত হয়েছে ইউক্যালিপ্‌টাসের সারিতে, সন্ধ্যার পরে সেখানে এসে দাঁড়ালে বহুদূরে দেখা যায় আলোকিত একটা সরীসৃপ রেখা। দার্জিলিং।

বাঁদিক দিয়ে নেমেছে খানিকটা ঢালু পাহাড়—পাইন আর রডোড্রেন্‌ডনের কুঞ্জ জড়াজড়ি করে আছে সেখানে। তার ভেতর দিয়ে একটি ছোট ঝরনার প্রায় শুকনো খাত। শ্লেট্ পেন্‌সিলের মতো সরু জলধারা পাথর চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে ক্লান্ত গতিতে। আরো কিছুদিন পরে তুষার শৃঙ্গে শৃঙ্গে গলবে গ্লেশিয়ার—সেদিন এই শুকনো খাতে খাতে নামবে চাঁদ গলানো আলোর মত একরাশ দামাল জলের প্রাণবেগ—শুধু নুড়িই নয়, জগদ্দল পাথরগুলোকেও ঠেলে নামবে সেইদিন।

লনে চেয়ার নামিয়ে বসে সিটিং দেন ব্রজেনবাবু। মুখের পেশী-গুলোকে শক্ত করে ঠায় বসে থাকেন। মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলোতে ঝিকমিক করে সূর্যের আলো। মনের দিক থেকে যতই বিতৃষ্ণা থাক, তবু শিল্পীর চোখ দিয়ে এইসব মুহূর্তে লোকটিকে তার খারাপ লাগে না। যেন গ্রীক্ ভাস্কর্যের মডেল—মিকায়েল অ্যাঞ্জোলার ছেনি-বাটালিতে খোদাই করা জুপিটারের সম্ভাবনা।

—আর কতক্ষণ?—শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে জানতে চান ব্রজেনবাবু।

—হয়ে এল, আর বেশিক্ষণ কষ্ট দেবেনা আপনাকে—ক্লান্তভাবে প্রতুল হাসে। যান্ত্রিকভাবে তুলি টানতে থাকে ইজেলের ওপরকার ক্যান্‌ভাসে।

—নিজের ছবি আঁকানোও দেখছি কম সমস্যার ব্যাপার নয়।—ব্রজেনবাবু মন্তব্য করেন।

প্রতুল উত্তর দেয়না। তেমনি এক টুকরো মৃদু হাসি লেগে থাকে তার ঠোঁটের কোনায়। অর্থহীন হাসি।

—ওইজন্যেই হয়তো মুসলমান ধর্মে পোর্ট্রেট আঁকানো বারণ। হয়তো ওঁদের কোনো মহাজন আর্টিস্টের পাল্লায় পড়েছিলেন সিটিং দেবার জন্যে—ব্রজেনবাবু রসিকতা করতে চান।

—অসম্ভব কী!—প্রতুল সংক্ষেপে জবাব দেয়।

নিচের পথটায় এক ঝলক তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ। উচ্চকিত আলাপের কলধ্বনি। নীরার গলাই সকলকে ছাপিয়ে উঠছে। মুহূর্তে অস্বস্তির ছায়া নামে প্রতুলের মুখে।

—আজ থাক তাহলে—হাত থেকে তুলিটা নামিয়ে রাখে সে।

—বাঁচা গেল—ব্রজেনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়েন : ধৈর্যের অগ্নি-পরীক্ষা যাকে বলে। চলো আর্টিস্ট, এবার তাহলে চা খাওয়া যাক এক পেয়ালা।

—তাই চলুন—সরঞ্জামগুলোকে গুছিয়ে নিতে নিতে ভীত চোখে তাকায় প্রতুল। নিচের দলটা কলরব করতে করতে লনে এসে ঢুকেছে এতক্ষণ!

এই দলটা!

আজ সাতদিন হল এসেছে কার্শিয়াঙে—প্রতুলের ভালোই লাগত। ভালো লাগতে পারত সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘা, ওপারের লক্ষ্মীশ্রীহীন আরণ্যক পাহাড়ের সারি, স্বনিত পাইনের বন, রাত্রির ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইউক্যালিপ্‌টাসের একটা লঘু গন্ধ। ভালো লাগতে পারত গায়ের ভেতর দিয়ে মেঘ ভেসে যাওয়া ছায়াচ্ছন্নতা—ওভারকোটের রোঁয়ায় রোঁয়ায় মুক্তা রেণুর মতো ফগের কণা। কিন্তু নীরা। গালের ওপরে কর্ণাভরণ থেকে রক্ত-প্রবালের নিষ্ঠুর দীপ্তি। কাচের গ্লাস ভেঙে পড়বার মতো হিংস্র হাসির শব্দ। অবজ্ঞা, অনুকম্পা।

প্রতুলের সঙ্গে যেটুকু পরিচয়, তা সৌজন্যের। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার একটা বিচিত্র ভঙ্গি।

—রিয়্যালি, আপনার ড্রয়িংয়ের হাতটি চমৎকার।

—ধন্যবাদ!—শুকনো গলায় জবাব দিয়েছে প্রতুল।

ড্রয়িংয়ের হাতটি চমৎকার! কম্‌প্লিমেন্ট? না।

—কিন্তু দেখুন—গলার স্বরকে অতিরিক্ত মিহি করে নীরা বলে, মডার্ণ আর্টে ড্রয়িংটা তো প্রায় ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে—কী বলেন?

—জানিনা।

মুখে বিনীত ভদ্রতার কোমলতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেও প্রতুল অনুভব করে তার কপালে গোটাকয়েক কঠিন রেখা ফুটে উঠতে চাইছে।

—ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট্‌দের আরো সাজেস্টিভ্‌ হওয়া উচিত—আরো অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস্‌। নতুন ফর্ম—নতুন টেক্‌নিক।

পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে—উপদেশ দিচ্ছে। মডার্ণ আর্ট! চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, কী জানো তুমি আর্টের? কী বোঝো?

বিলিতী পত্রিকার প্রবন্ধ পড়ে নিজেকে জাহির করবার এই নির্লজ্জ নির্বুদ্ধিতা বন্ধ করো।

কিন্তু বলা যায় না। তার চেয়ে মুখে খানিক বিকৃত হাসি ফুটিয়ে তোলা ঢের সহজ।

নীরা হয়তো বুঝতে পেয়েছে তাকে। তাই কয়েকদিন থেকে একটা নেপথ্য আক্রমণ চলেছে তার ওপর। একা নয়—সংঘবদ্ধভাবে।

জনকয়েক চেঙ্গার বন্ধু জুটেছে এখানে। যেমন হয় এসব জায়গায়। কলকাতার স্ববারি এখানকার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আরো বীভৎস, আরো উগ্র হয়ে দেখা দেয়। কলকাতার গোলাপী শীতে যে সব জামাকাপড় পরলে লোকে পাগল বলে—এখানে তাদের প্রদর্শনীর সুযোগ মেলে। আর মেলে দায়িত্বহীন অখণ্ড অবকাশ—রোম্যাণ্টিক্ ন্যাকামির অবাধ অবসর।

—ওঃ, হাউ নাইস্!

—ইট্‌স এ ড্রীম!

—আই লাভ ইট্!

মরুক গে, প্রতুলের তাতে কিছু আসে যায়না। কিন্তু তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে কেন এই আর্ট-সমালোচনার প্রহসন! কেন এই ফাঁকা পাণ্ডিত্যের ফানুস ওড়ানো? কেন তাকে আঘাত করবার এই অকারণ কৌতুক?

একজন অধ্যাপক জুটেছেন—অধ্যাপক দে। পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে শেষ কথা বলবার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন তিনি। তাঁর প্রতিটি বাণীর শেষে মাত্র একটি ধুয়া বেজে ওঠে: আই অ্যাম স্যার ওর্যাকল!

—কিউবিজম! জিয়োমেট্রিক্যাল আর্ট! ওই হল আধুনিক জীবনের বৈজ্ঞানিক ইণ্টারপ্রিটেশন। আজকের সভ্যতায় সমস্তটাই

যেমন জিয়োমেট্রিক্যাল প্ল্যানিংয়ের ওপর, শিল্পও কেন তাকে অনুসরণ করবে না ?

একজন চক্রবর্তী আছেন দলে। ফেঁপে উঠেছেন ইন্সিয়োরেন্সের কাজ করে। হঠাৎ-ঐশ্বর্যের আভিজাত্যটাকে কী করে ঘোষণা করবেন এই নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত থাকেন চক্রবর্তী। দিনের মধ্যে ছবার পোষাক বদলান। সোনার সিগারেট কেসে চার রকম সিগারেট রাখেন।

আর্টটা চক্রবর্তীর পরিধির বাইরে গিয়ে পড়ে। না বিদ্যেয়, না রুচিতে। তবু গলার 'রিয়্যাল্ সিল্ক টাই'টাকে আঙুলে জড়াতে জড়াতে নিজের সিদ্ধান্ত জানান : বড্ড এক্সপেরিমেণ্টাল্ !

—এক্সপেরিমণ্টাল্ ! দে চটে ওঠেন : এক্সপেরিমেণ্ট ইজ্ অ্যাড্-ভান্স্‌মেণ্ট ! দেখুন পিকাসোকে, ব্রেককে লক্ষ্য করুন। ম্যাথ্‌মেটিক্যাল আর্টের মধ্য দিয়ে সুর আর ছন্দ দোলা খেয়ে উঠেছে—রিয়্যালিটির সঙ্গে আইডীয়ার কী সিংক্রোনাইজেসন—

গালভারী কথাগুলো কানের মধ্যে এসে বন্দুকের গুলির মত আঘাত করে প্রতুলকে। এরা সমালোচক—সমঝদার ! কিন্তু জীবনের কোন্ জটিলতা এ যুগের শিক্ষাকে নিয়ে যাচ্ছে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর প্রকাশ ভঙ্গিতে, কোন্ অতৃপ্ত বিতৃষ্ণা তার নৈরাজ্যবাদী মনকে আকর্ষণ করছে সীমাহীন শূন্যতায় : একটা Intellectual nothingness-এ, এরা কি তার সন্ধান রাখে ? ইয়োরোপীয় সভ্যতার কোন্ বিকার আজ জীবনের স্থিতিবোধ থেকে শিল্পীকে নিয়ে যাচ্ছে ভগ্নাংশের পোড়ো জমিতে—এ সত্য কতটুকু বুঝেছে পরের মুখের ঝাল-খাওয়া এই অধ্যাপক ?

সে শিল্পী। নিজের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে সেই বেদনাকে সে খানিকটা ধরতে পারে। বুঝতে পারে শূন্য আকাশে মুঠি তুলে কিছু একটা আঁকড়ে

ধরার এই অসহায় আকুতিকে। এক্‌সপেরিমেণ্ট—শূন্যতা! ফর্ম ছাড়া দেউলিয়া শিল্পের অবলম্বন কোথায়?

কিউবিজম্‌। ইম্‌প্রেশনিজম্‌। এক্সপ্রেশনিজম্‌। স্যুর্‌রিয়্যালিজম্‌—

ইজ্‌মের পর ইজ্‌ম—কথার পরে কথা। সত্য খুঁজছে—জীবন থেকে সন্ধান করছে জীবনাতীতকে। শিল্পের মায়া-দর্পণে কলাবতী রাজকন্যা ঝলমলিয়ে উঠছে না রূপের আলোয়। পিকাসোর ছবি মনে পড়ে—'নারী আর মোরগ'। কোকিল আর রূপসীর যুগ শেষ হয়ে গেছে; নারীর মুখে চোখে একটা বীভৎস বুভুক্ষা—মোরগ আজ তার খাদ্য। মায়া-মুকুরের কনক-ফলকে দেখা দিচ্ছে থ্রি ডাইমেনস্থান—দেহ-লাবণ্য নয়, দেহযন্ত্র! হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, পাকস্থলী!

—আর আমাদের দেশের আর্টিস্ট?

নীরার প্রশ্ন। ছুরির মতো ধারালো গলা। একটা নগ্ন নিষ্ঠুরতা।

উত্তর দেয় অধ্যাপক। আর সেই উত্তর শুধু শোনবার জন্য নয়—যেন প্রতুলকেও শোনাতে চায় নীরা।

—আমাদের দেশের আর্টিস্ট?—অধ্যাপকের গলায় অবজ্ঞার সুর বাজে: কিছুটা গগন ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বোস আর যামিনী রায়। অন্ধকারে গোটাকয়েক জোনাকি।

—বাকী সব?—নীরা যেন প্রত্যক্ষ অপমানটা টেনে আনতে চায় প্রতুলের ওপরে।

—বাকী সব?—অধ্যাপক একটা চুরুট ধরান: ইস্কুলের ড্রয়িং ক্লাশের ছাত্র।

উঠে দাঁড়ায় প্রতুল। হাতের মুঠোটাকে প্রচণ্ড একটা ঘুষিতে রূপায়িত করে বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে দের মুখের ওপর। কিন্তু কিছুই

করা যায়না। নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে, লন পার হয়ে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

আজও ওখানকার শব্দভেদী বাণগুলোর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে পালিয়ে এসেছে। আর্ট! সৃষ্টির আদিমতম যুগ থেকে শুরু করে মানুষের স্বপ্ন-সাধনা! কোথায় হটেন্‌টট্‌-বুস্‌মেনের গুহাচিত্র—গ্রীসের স্বর্ণযুগ—ইটালিয়া আর হিস্পানিয়ার রেখাছন্দ, অজন্তা-ইলোরার বিভ্রম-বিলাস! ইতিহাস—সৌন্দর্যবোধ—ধর্মের ঘৃতদীপ! দেব শিল্পী র‍্যাফেল্‌, পারস্যের বিহ্‌জাদ, ভারতের ধীমান বীতপাল! মহাজীবনের রেখাবলম্বিত অপরূপ ইতিকথা!

সে ইতিহাস এরা বুঝবেনা। সে হৃদয় নেই—সে অনুভূতি নেই। কথার পরে কথা। ধ্যানের গভীরতা নেই, তাই চীৎকারের কলরোল!

পায়ে পায়ে হেঁটে সে বড় ঝর্ণাটার ধারে এসে বসল।

পাথরের আড়ালে আড়ালে ফুল ফুটেছে। ঝর্ণার জলের উল্লাসে উল্লাসে ফুল ফুটছে নুড়ির গায়ে। আকাশ থেকে চাঁপাফুলের একরাশ পাঁপড়ির মতো ঝরে পড়ছে সূর্যের আলো। দূরের কালো কালো জংলা পাহাড়গুলোও হয়তো পুলকিত হয়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনি ফুলে। একটা দূরবীণ থাকলে স্পষ্ট করে দেখা যেত হয়তো।

পাইন বন নিঃস্বনিত হচ্ছে। হাওয়ায় চোখে মুখে ছিটকে আসছে ঝর্ণার জলের একরাশ স্নিগ্ধ কণা। মাথার ভেতর থেকে যেন একতাল পুরু ইস্পাতের ভার নেমে যাচ্ছে তার। আর্ট, সৌন্দর্য। আকাশে, বাতাসে, ঠাণ্ডা পাহাড়ী হাওয়ায়—কনক চাঁপা রঙের রোদে। শিল্পের উৎস—সুরের প্রেরণা।

আদি-অন্তহীন হিমালয়ের তরঙ্গিত বিস্তারের দিকে স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সে। যেন দৃষ্টির সামনে থেকে একটা পর্দা সরে যাচ্ছে তার।

দেখা দিচ্ছে ধ্যান-গম্ভীর একটা বিরাটের মূর্তি ; তার তুষার জটায় জটায় মহাকাল শুদ্ধ হয়ে আছে—রজতশুভ্র নাগমালার মতো তার বুকে দুলছে গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের সহস্রবেণী—গুহায় গুহায় অবরুদ্ধ জলস্রোতে তার গুরু গুরু ডম্বরু বেজে উঠছে।

হিমালয়। 'পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।' দেবতাত্মা নয়—প্রমূর্ত দেবতা স্বয়ং। নিকোলাস্ রোরিকের ছবি। হিমালয়ের প্রাণসত্তা ধরা দিয়েছে যোগী-শিল্পীর রেখার সংকেতে সংকেতে।

পেছনে ঝুপ করে একটা শব্দ হল।

ফিরে তাকালো প্রতুল। মনে হল, 'তূলিকয়েব চিত্রং'। যেন তার মগ্ন-চৈতন্যের কামনা বাস্তবে প্রাণ পেয়ে উঠেছে আকস্মিকভাবে। 'কুমার সম্ভবের' শ্লোক-সরণি থেকে পথ ভুলে নেমে এলেন কুমারী গৌরী।

একটি পাহাড়ী মেয়ে। সতেরো-আঠারোর বেশি বয়েস হবেনা। পাহাড়ী ফুল সংগ্রহ করছে ঝর্ণার আশপাশ থেকে। তারই পায়ের ধাক্কায় কখন একখানা পাথর খসে পড়েছে ঝর্ণার জলে।

আশ্চর্য ভালো লাগল। মনে হল, এতক্ষণ ধরে যেন এইটুকুর জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল সে। মনের মধ্যে একটা পটভূমি তার তৈরী হয়েই ছিল—রোদে, আকাশে, ফুলে, হাওয়ায়। মাঝখানের জায়গাটুকু ফাঁকা পড়েছিল একান্তভাবে এই মেয়েটিরই জন্যে।

ক্ষিপ্রহাতে পকেট থেকে সে স্কেচ্-বুক বার করল।

নিবিষ্ট মনে ফুল তুলে চলেছে মেয়েটি। মাথা তুলে প্রতুলকে তাকিয়েও দেখল বারকয়েক। কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনো জিজ্ঞাসা নেই—চিহ্ন নেই কোনো কৌতূহলের। তার দিকে তাকালো, না তার পেছন দিয়ে পাহাড়-টাকেই দেখল সেটাও যেন বোঝা গেল না স্পষ্ট করে।

অভ্যস্ত অনায়াসে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্কেচ্টা শেষ করল প্রতুল।

কিছুক্ষণ তার ওপর পেন্‌সিলের দাগা বুলিয়ে রেখাগুলোকে তুলল স্পষ্টতর করে।

তারপর :

গলার স্বরটা একটু তুলে ডাকল : এই কেটি!

'কেটি' অর্থাৎ খুকি এবার বিস্মিত চোখ মেলে দিলে প্রতুলের ওপর।

—কেটি, শোন্‌ ?

কেটি দু চোখ ভরা প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে এল প্রতুলের দিকে। হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, ডাকছ কেন ?

একটা অকারণ খেয়ালে স্কেচ্‌-বুক থেকে একটানে পাতাটা ছিঁড়ে নিলে প্রতুল। মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এই নে তোর ছবি।

—আমার ছবি ?

কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই লজ্জিত আনন্দে সারা মুখখানা যেন রাঙা হয়ে উঠল তার। তারপর ছোঁ মেরে প্রতুলের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়েই সামনের পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুতবেগে।

তাইতো!

বোকার মত প্রতুল বসে রইল খানিকক্ষণ। যেন ভালো করে বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। অন্যায় করে ফেলল নাকি ? এদেশের রীতি-নীতি তার তো ভালো জানা নেই। খুব সম্ভব নেওয়ারী মেয়ে। সাধারণ নেপালী বা ভুটিয়াদের চাইতে এদের আত্মমর্যাদা বেশি—অনেক সজাগ আভিজাত্য-বোধ। কী ভেবেছে কে জানে। অপমান মনে করে কোনো কুক্‌রীধারী আত্মীয়কে ডেকে নিয়ে না আসে।

কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে কাটাতে হল না অনিশ্চয়ের মধ্যে।

আরে—আরে একি! সারা গায়ে মাথায় ঝুর ঝুর করে একরাশ ফুল

পড়ছে যে। চমকে তাকিয়ে দেখল সেই মেয়েটি। ঝর্ণার জলের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে হেসে উঠেছে আনন্দে আর কৌতুকে।

প্রতুল ভালো করে তাকিয়ে দেখার আগেই আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা যাক। কিন্তু সমস্ত চেতনা যেন তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ভরে উঠেছে তৃপ্তির অজস্রতায়। নিবিড় কালো খানিক মেঘের গায়ে মেয়েটি এঁকে দিয়ে গেছে বিদ্যুতের রূপরেখা। শিল্পীকে দিয়ে গেছে তার পুরস্কার।

আর কোনো ক্ষোভ নেই। জীবনের কাছ থেকে একটা মস্ত বড় পাওয়া যেন মিটে গেছে তার। যে দাম আগরওয়ালা দিতে পারেনি, ব্রজেনবাবু কল্পনা করতে পারেন না, দের পাণ্ডিত্য যাকে স্পর্শ করতে পারেনা। আকাশ-আলো-সৌন্দর্য। ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে শিল্পের ঋণ শোধ করছে পৃথিবী। একটা আশ্চর্য পরিপূর্ণতা নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

বাড়িতে ফিরল অনেক বেলায়। মহাকালের পাহাড়ে উঠে, নিচের সমতলের একরাশ স্কেচ নিয়ে। আজ যেন পাহাড় ভাঙতে একটুও ক্লান্তি লাগেনি। ওভারকোটের পকেটে পকেটে ফুলগুলো হয়তো এতক্ষণে বিবর্ণ হয়ে গেছে—কিন্তু সমস্ত মনটা ফুটে আছে একটা সূর্যমুখীর মতো।

কিন্তু লনে পা দিতেই একটা শঙ্কিত অস্বস্তিতে সে দাঁড়িয়ে গেল।

নীরাই তাকে আগ্ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করতে এসেছে।

—মাই গড্, এতক্ষণ পর্যন্ত কোথায় ছিলেন? আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রাণ।

বলতে ইচ্ছে করল, ঘরে বসে বসেই খুঁজছিলেন নিশ্চয়?—কিন্তু শুধু নিজের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে একবার চেপে ধরল প্রতুল। তারপর:

—হঠাৎ এই সৌভাগ্য কেন আমার?

—বাঃ—আমরা পিক্‌নিকে যাব যে—ছেলেমানুষের মতো আনন্দিত নীরার গলা : আপনাকে যেতে হবে।

—ব্রজেনবাবু যাবেন তো ?

—বাবা ?—নীরা হাত উল্‌টে একটা হতাশার ভঙ্গি করল : জানেন না বাবাকে। কোনো উৎসাহ যদি থাকে এ সব ব্যাপারে। সোজা বললেন বাতের ব্যথা, নড়তে পারবেন না। কাজেই মাও থাকবেন। যাচ্ছি আমি, আপনি, অধ্যাপক দে আর মিস্টার চক্রবর্তী।

চোখের সামনে যেন একটা অন্ধকার কালো গহ্বর দেখতে পেল প্রতুল।

—আমাকে না হয় এ যাত্রা ছেড়েই দিন।—একটা আকুতি ফুটে বেরুল তার গলায়।

—পাগল ! আপনাকে ছাড়লে চলে ! না-না, ওসব হবেনা। ঠিক বারোটায় আমরা বেরুব, রেডি হয়ে থাকবেন আপনি—কেমন ?

প্রতুল আর একবার বলতে চাইল : কিন্তু—

—না, কোনো কথা নয়। যেতেই হবে আপনাকে।—নীরা দুচোখ থেকে মোহভরা কটাক্ষ বর্ষণ করল। দুটি গালে দোলা খেয়ে গেল রক্ত-প্রবালের দীপ্তি।

প্রতুলের জিভটা কে যেন টেনে নিয়েছে গলার ভেতরে। একটা কলের পুতুলের মতো সে মাথা নাড়ল। গভীর জঙ্গলে যেন অজগরের চোখের টানে থমকে দাঁড়িয়েছে হরিণ।

—তাহলে রেডি থাকবেন কিন্তু, যেন ভুল না হয়—সর্বাঙ্গে দোলা জাগিয়ে নীরা চলে গেল।

কিন্তু অজগরের চোখই বটে ! জুনোর বক্র-নয়ন। অভিশাপের ছায়া। তার পরিচয় পেতে বেশি দেরী হল না প্রতুলের।

## ছয়

এ কোন্ বাংলা দেশ ?

মাঠের পর মাঠ। রঙের ছিট দেওয়া অভ্রের পাতের মতো শ্যাওলা-ছাওয়া জলা। বাবলা, হিজল, আশ্‌, শ্যাওড়া, বিলিতি পাকুড়, আদ্যিকালের বট, তাল আর নারকেল। বাঁশবন ঝেঁকে আসা বৃষ্টি। একরাশ তরতরে কচুগাছের তলায় ঝিঁঝিঁর ডাক।

এখানে এলে মুছে যায় সে বাংলা দেশ। নতুন পৃথিবী। এ যেন ক্যানাডিয়ান্ ল্যাণ্ড্স্কেপের জগৎ। খাড়া কালো পাহাড় দুধারে। সাড়ে তিনশো ফুট নিচে খরবাহিনী নদীর গতিটা সামনে খানিকদূর পর্যন্ত দেখা যায়, তারপরেই তা হারিয়ে গেছে ঘন জঙ্গলে আর অতিকায় গ্র্যানাইটের স্তরে। পেছনে সমতল দেখা যায় নদীর রেখাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু দৃষ্টি সেখানেও রুদ্ধ হয়ে যায় দুর্ভেদ্য শালবনে।

সাড়ে তিনশো ফুট নদীর ওপরে দুধারের পাহাড়গুলোকে যুক্ত করেছে একটি সেতু। মানুষ-বিশ্বকর্মার হাতে যেন বনমানুষের হাড়ের ভেল্‌কি। স্তম্ভ নেই—একটি বিরাট ধনুরেখার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সাঁকোটি। তার ওপর দিয়ে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে চলে গেছে পথ। এই পথ দিয়েই চলে হিমালয়ের চা আর কাঠ—পিচের পথ পেছল হয়ে থাকে মোটরের তেলে। যুদ্ধের সময় সৈন্য ছুটত বর্মা ফ্রণ্টের দিকে—ট্রাক্, জীপ্, লরী। পাহাড়ের কোনে কোনে 'জেড্'—কঙ্কালের মুখ। মদের ঝোঁকে বেসামাল ষ্টিয়ারিং নিয়ে বহু ট্রাক্ আর জীপ্ সাড়ে তিনশো ফুট পাহাড় গড়িয়ে নিচের হিমানীগলা জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

চলন্ত মোটরের উদ্দাম গতিবেগ থাকলেও সব কিছু মিলিয়ে একটা

বিচিত্র স্তব্ধতা। একটা নগ্ন ইতিহাসপূর্ব বন্য-সৌন্দর্য। যেতে যেতে হঠাৎ এক আধটা গাড়ি থমকে দাঁড়ায় পুলের ওপর, ক্যামেরার শব্দ ওঠে ক্লিক্ ক্লিক্। লোকে বলে, পৃথিবীর একটা সেরা বিউটি স্পট্।

পুল পেরিয়ে এদের মার্কারি গাড়ি এসে লাগল একটা ঝর্ণার ধারে।

রাশি রাশি বুনো কলার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে বড় বড় পাথরের স্তূপে ফেনিল হাসির ঘা দিয়ে, রূপোর মত ঝকঝকে জল নামছে। শোনা যাচ্ছে চাপা গুঞ্জনের মত তরল ধ্বনি। পাহাড়ের কোলে বেগুনী ফুল দুলছে থোকায় থোকায়। চিরিপ্ চিরিপ্ করে শোনা যাচ্ছে অলক্ষ্য পাখির ডাক। পিক্‌নিকের পক্ষে আদর্শ জায়গা—সন্দেহ কী!

দে চোখের গগ্‌লস্‌টা খুলে প্রথমেই বললেন, ওঃ, ডিভাইন!

চক্রবর্তীর একটু সময় লাগল ট্রাউজারের ক্রীজ্ টেনে-টুনে ঠিক করে নিতে। তারপর পকেটের সিগারেট কেসটা হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, সত্যি!

নীরা আবেগে ছলছল করে উঠল।

—এখানে এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, এই খানেই মরে যাই!

ন্যাকামি! হা হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হল প্রতুলের। এইখানেই থাকতে চাও! থাকো। তারপর সন্ধ্যা আসুক, আকাশ-মাটিজোড়া একটা বিশাল ভালুকের মতো নামুক রাত্রি, তার হিংস্র থাবার নোখের মতো জলজল করুক নিচের নদীটা। সেই মুহূর্তে অরণ্য যখন প্রাণ পেয়ে উঠবে, তখন এই ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়ো একবার। তখন এই রাত সাপের বিষের মতো তোমার হৃৎপিণ্ডকে সহস্র খণ্ডে চুরমার করে দেবে। আর মরে যেতে চাও? তারও জন্যে আছে নিচে নদীর হিমস্রোত, একবার

ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, খরস্রোতে বয়ে চলা পাথরে পাথরে কিংবা কোনো ডুবো পাইনের গুঁড়িতে—

—কেমন লাগছে আর্টিস্ট্?—দের অযাচিত প্রশ্ন। অনুকম্পার রেশ মেশানো। একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছে প্রতুল, দে কখনো নাম ধরে ডাকেন না তাকে। আর্টিস্ট্ কথাটার ওপর সামান্য একটু মোচড় দেন, মিশিয়ে দেন অবজ্ঞার খাদ।

প্রতুল জবাব দিল না।

তার হয়ে কথা বললে নীরাই।

—কেমন আর লাগবে? শিল্পী মানুষ, তলিয়ে গেছেন নিজের মধ্যে।

এও ব্যঙ্গ। আর কারো মুখে শ্রদ্ধার মতোই হয়তো শোনাতো, কিন্তু নীরার নয়। প্রতুল জানে। জানে: ভাবমগ্নতার মূল্য নেই এখানে। এরা কথা কয়, এরা তর্ক করে, এরা তত্ত্ব কপচায়। গভীর-চারণা নেই, শুধু লঘু স্রোতের মতো ঝলক দিয়ে ওঠে। মুখরতা এদের প্রসাধন, বাচালতা এদের আভরণ। স্তব্ধতা নয়, উপলব্ধি নয়। ফুলকির মতো ঠিকরে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু জ্বলতে পারে না নিবাত শিখার জ্যোতির্ময় প্রশান্তিতে।

প্রতুল বললে, ধন্যবাদ।

দে একখানা পাথরের ওপর বসে পড়লেন। হাত বাড়ালেন চক্রবর্তীর দিকে।

—একটা সিগরেট দিনতো মশাই। আপনার সেই কালো সিগরেটগুলো।

—সঃ, সব্রিনো?—চাররকম সিগারেট কেস্ থেকে চক্রবর্তী এগিয়ে দিলেন: আমিও বেশ রেলিশ্ করি এগুলো। সিগার আর সিগারেটের স্বাদ একসঙ্গেই পাওয়া যায়।

প্রতুল একবার তাকালো। হিমালয় থেকে সিগারেট। সিগারেটের পরে আসবে হয়তো পেরিনিয়াল ফিলসফি। সেখান থেকে গড়াবে দামোদর স্কিমের হাইড্রো-ইলেকট্রিক পসিবিলিটি। এই এদের পরিচয়—এদের জীবন। কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই, তাই সরে সরে চলে। স্থিতিভূমি নেই, তাই প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে অপসরণ।

দে বললেন, বুঝলেন আর্টিস্ট্, দেখতে শিখুন, তাকাতে শিখুন। ওদেশের শিল্পীরা পৃথিবী ঘুরে উপকরণ সংগ্রহ করে। আপনারা শুধু ঘরে বসে অজন্তা আর মোগল আর্ট কপচান, নয়তো ওদের দশবছরের বাসী ফর্মগুলো নিয়ে নকল করতে থাকেন। ওতে কিছু হবেনা মশাই। এক ওরিয়েণ্টাল ভেঙে আর কতদিন চালাবেন ?

"Too Provincial, too talkative, too cruel—" একদিন দা ভিঞ্চি আবিষ্কার করেছিলেন ফ্লোরেন্সে পা দিয়ে। এও সেই ফ্লোরেণ্টাইন নিষ্ঠুরতা, প্রগল্‌ভতা, বুদ্ধির বাচাল আভিজাত্যের প্রাদেশিকতা। ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। এখানে আর সে থাকতে পারে না। আত্মতৃপ্ত ব্রজেনবাবুর স্থূলতাকে তবু একরকম সহ্য করে নেওয়া যেত, কিন্তু এরা—

নীরা বললে, যাই বলুন, হিমালয়ের রূপ তবু অনেকটা ফুটেছে রোরিকের হাতে।

—রোরিক ?—দে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন : হাঁ, জাস্ট টলারেবল্। কিন্তু—

অসহ্য। এই উন্নাসিক আত্মরতি জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরে। রোরিক। সেই ভাবতন্ময় শিল্পীকে জানতে গেলে যে মন, যে দৃষ্টি দরকার—সে দৃষ্টি অন্তত এদের কোনদিন উন্মেষিত হয়ে উঠবে না।

প্রতুল পা বাড়াল।

—ওদিকে কোথায় চললেন ?—নীরা প্রশ্ন করল।

—একটু ঘুরে দেখে আসি—সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে প্রতুল।

—একটু চা খাবেন না ?

—আপনারা খান, আমি ঘুরে আসছি—প্রতুল একটু দ্রুতপায়েই পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরল। আঃ, বাঁচা গেল। আর ওদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এইবার—এইবার বিশাল হিমালয়ের আদিমতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। প্রাচীরের মত পাহাড় উঠেছে একপাশে—একটা ভয়ঙ্কর বন্য সৌন্দর্য তার—কোনো আদিম টাইটানের রোমশ বুকের পাঁজরার মতো। অনেক ওপরে কালো জঙ্গলের ভেতর এক একটি শুভ্র রেখা—ঝড়ে উপড়ে পড়া কোনো বিশাল গাছের শুকনো গুঁড়ি; কোথাও কোথাও একরাশ ফুলের হাতছানি—আশে-পাশে মথের সাতরঙা পাখা মেলে আনাগোনা; পিচের পথের পাশে পাশে ঝিরঝিরিয়ে নামছে ক্ষীণ ঝর্ণার রেখা।

এপাশে খাদ—অতলান্ত খাদ ঘন জঙ্গলে একাকার। নদীর ধারে ধারে যতদূর যাওয়া যায় শুধু শাল গাছের বিন্যাস। করকরে বালি আর চকচকে নুড়ি ঝিকমিক করছে বিকেলের রোদে। বিশালকায় একটা সরল গাছ ভেসে চলেছে নদীর স্রোতে—উঁচু হয়ে আছে দুটো ন্যাড়া ডাল, হঠাৎ মনে হয় প্রকাণ্ড শিংওলা একটা সম্বর হরিণের শবদেহ।

পায়ে পায়ে প্রতুল এগিয়ে চলল ;

খানিকদূরে দেখা হল আর একটি বড় ঝর্ণার সঙ্গে। পাহাড়ের বুকে সিঁড়ির ধাপ কেটে কেটে নেমেছে ঝর্ণাটা। প্রতুল থেমে দাঁড়াল, তারপর অন্যমনস্কের মতো শ্যাওলা পড়া পাথরে পা দিয়ে দিয়ে ঝর্ণার পথ ধরে ওপরে উঠতে লাগল।

অচেনা পাহাড়ে এমনি করে ওঠার একটা নেশা আছে—উল্লাস আছে বিস্ময় বিচিত্র অভিযানের। এ যেন নিজের আবিষ্কার, নিজের সৃষ্টি। এই যে মাথার উপর অচেনা গাছের ডালে দুটো বানর নিজের মনে লাল ফল খাচ্ছে, এ দেখবার জন্যে প্রতুল ছাড়া আর কেউ তো উপস্থিত নেই এখানে। কে জানত, দুর্গম বুনো পাহাড়ের এত ওপরেও পাথরের ফাঁকে জমে থাকা এক টুকরো জলের মধ্যে নরম শ্যাওলার সঙ্গে কতগুলো কুচো চিংড়ি বাসা বাঁধতে পারে? একটা পত্রহীন গাছের ডালে লম্বা লম্বা ঠোঁটওলা একজোড়া ধনেশ পাখির এই যে কৌতূহলমাখা দৃষ্টি, এতো একান্তভাবে তাকেই লক্ষ্য করে!

খানিকদূর উঠে চমৎকার জায়গা মিলল একটা। শালবনের ছায়ায় বিরাট একখণ্ড পাথর। পাহাড় ভেঙে ক্লান্ত প্রতুল বসে পড়ল তারই ওপর। স্তব্ধতায় ঘেরা চারদিক। শুধু শালপাতার মর্মর, চাপা কান্নার মতো ঝর্ণার শব্দ, আর দূরে কাছে পাখির ডাক। মন যেন জুড়িয়ে গেল। স্কেচ্ বুক বের করল প্রতুল।

বেশ একটি ধ্যানস্তিত অবকাশ। জন-মানব আসবার সম্ভাবনা নেই। নিচের পিচ ঢালা পথ দিয়ে মাঝে মাঝে যে সব লরী আর মোটর ছুটে চলেছে তাদের কোনো কোলাহলই এখানে এসে পৌছুবে না। আর সব চাইতে বড় কথা: এখানে দের পাণ্ডিত্যভরা গবেষণা শোনা যাবেনা, একরাশ ভাঙা কাচের মতো গায়ে এসে বিঁধবে না নীরার হাসি, কানে আসবে না চক্রবর্তীর সিগারেট-তত্ত্ব: আই লাইক্ অ্যামেরিকান্ ব্লেণ্ড্! যেমন একটা আলাদা ফ্লেভার আছে—

চুলোয় যাক ওরা। হাসুক, গল্প করুক, তর্কের ঝড় তুলুক, চলুক ওদের পিক্‌নিক্। এখানে নিজের আবিষ্কৃত পৃথিবীতে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে প্রতুল। এ তার ধ্যানের আসন—কল্পনার আকাশ।

স্কেচ বুক নিয়ে সে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যার ছায়া নামতে সুরু করল, আরণ্যক রাত্রি পদসঞ্চার করল শালবনের ভেতর, তখন প্রতুলের খেয়াল হল। তাই তো—অনেক দেরী হয়ে গেছে। ওরা কী ভাবছে, কে জানে! এবারে ওঠা যেতে পারে।

স্কেচ্-বই পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াতে যাবে, ঠিক এমনি সময় একটা গম্ভীর গর্জন গম্ গম্ করে উঠল পাহাড় জুড়ে। মাথার ওপরে কলরব তুলে আকাশে উড়ল এক ঝাঁক পাখি। মুহূর্তের জন্যে প্রতুলের সারা শরীর শক্ত হয়ে গেল পাথরের টুকরোর মতো।

বাঘ ডাকছে!

বাঘ ডাকছে! সাড়া দিচ্ছে আদিম অরণ্যের আদিম হিংসা। সন্ধ্যার ছায়া তার কালো গুহার অন্ধকারকে আরো কালো করে তুলতে তার ঘুম ভেঙেছে। জেগেছে নিশীথ-সাম্রাজ্যের নিশাচর সম্রাট।

আবার গুম্ গুম্ করে পাহাড় জুড়ে প্রতিধ্বনি জাগল। বাঘের ডাকই বটে—কোনো সন্দেহ নেই! প্রতুল যেন স্পষ্ট দেখতে পেল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দ পথে তারই দিকে এগিয়ে আসছে, দপ দপ করে জ্বলছে দুটো ক্ষুধার্ত হিংস্র চোখ—

নিজের অজ্ঞাতেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ করল প্রতুল। দ্রুতবেগে নামতে লাগল শ্যাওলায়-পিছল পাথরে পাথরে পা ফেলে। পায়ের তলা থেকে হড়কে যেতে লাগল এক একটা নুড়ি—বিকট শব্দে আছড়ে পড়তে লাগল নিচে।

প্রাণের ভয়ে কেমন করে প্রতুল যে পথের ওপর নেমে এল, নিজেই ভালো করে বুঝতে পারলনা। মাথার ওপর ডাকটা শোনা যাচ্ছে আরো ঘন ঘন, আরো অধৈর্য। ক্ষুধা! সমস্ত দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা।

যে হিমালয় কবির নয়, শিল্পীর নয়—নগ্ন নিষ্ঠুর সেই প্রাগৈতিহাসিক হিমালয়ের রাত্রির ইতিহাস শুরু হয়ে গেছে। জেগেছে তার সম্রাট!

উর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটতে লাগল। বড় ঝর্ণাটার কাছে যখন এসে পৌছুল, তখন দেখা গেল মোটরের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। পড়ে আছে তিন চারটে চায়ের কাপ, একটা থার্মো ফ্লাস্ক, কিছু খাবার ছড়িয়ে আছে, আর আছে একপাটি চকচকে জুতো! অধ্যাপকের জুতো!

এক পলকের মধ্যে ভয়ঙ্কর সত্যটা উদ্‌ঘাটিত হল তার কাছে। ওরা পালিয়েছে। বাঘের ডাক শোনবামাত্র গাড়ি নিয়ে চম্পট দিয়েছে প্রাণপণে। আর তাকে ফেলে রেখে গেছে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসা এই নির্জন পাহাড়ে—যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুরে ফিরছে হিংসা, যার প্রতিটি ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে মৃত্যু!

সমস্ত অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, শুধু একটিমাত্র প্রেরণা জেগে আছে মনের মধ্যে। বাঁচতে হবে—বাঁচতেই হবে যেমন করে হোক। এই পাহাড় আর জঙ্গলে এমন করে সে মরতে পারবে না। না—কোনোমতেই না!

আবার পাহাড় কাঁপিয়ে গর্জন উঠল। মনে হল যেন কানের কাছে; যেন মাত্র দুহাত পিছনে! অমানুষিক ভয়ে সোজা ব্রীজের দিকে ছুটতে লাগল প্রতুল।

কিন্তু বেশিদূর তাকে ছুটতে হলনা।

পাহাড়ের একটা 'জেড্‌' ঘুরে দেখা দিলে দ্রুতগামী একখানা জীপ। প্রতুল যখন সামনাসামনি সেটা দেখতে পেল নিজেকে আর সামলে নেবার সময় ছিলনা তখন। অসহ্য যন্ত্রণায় চেতনা হারিয়ে ফেলবার আগেই সে টের পেল, কয়েক হাত এগিয়ে গিয়ে সশব্দে থেমে পড়েছে জীপটা আর দু তিনজন মানুষ ছুটে আসছে তারই দিকে।

## সাত

চেতনাটা তখনো ঘুরছে নীহারিকার অস্পষ্টতায়। একরাশ চুরুটের ধোঁয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কতগুলো মুখ—যেন স্কেচ বইয়ের আঁকা; কোনো রূপ নিয়ে ধরা দেবার আগেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। বস্তু-জগৎটা যেন কুয়াশায় ঢাকা একটা গিরি-সংকট; মাঝে মাঝে সে কুয়াশার আবরণ সরে গিয়ে কতগুলো ছায়ামূর্তির আভাস মিলছে—তারপরেই ধূমল শূন্যতা।

জুতোর শব্দ—চাপা গলার আওয়াজ—'এটা খেয়ে নিন'—'একটা ইন্‌জেক্‌শন?' 'না কন্‌সান্স হয়নি'—'ন্যারো এস্‌কেপ'—কাচের গ্লাসের ঠুন্‌ঠুনানি। মাথার ওপর কার যেন ঠাণ্ডা হাত। মা?

প্রতুল চোখ মেলল। ধোঁয়ার পর্দাটা সরে গেছে হঠাৎ। মা?

না, মা নয়। গলায় স্টেথিসকোপ—মাঝবয়েসী একজন ডাক্তার। কলকাতার বাড়ি নয়—ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল, হাসপাতাল।

—আমি কোথায়?—ক্ষীণস্বরে প্রতুল জানতে চাইল।

ডাক্তার হাসলেন।

—শিলিগুড়ির হাসপাতালে।

—শিলিগুড়ি? কেন?

—কালিম্পংয়ের রাস্তায় একটা মোটর অ্যাক্‌সিডেণ্টে পড়েছিলেন আপনি।

প্রতুল ভাবতে চেষ্টা করল। কী যেন মনে পড়ছে—অথচ ভাল করে ধরা দিচ্ছে না চেতনার ওপরে। গিরিসংকটের ওপরে আবার ঘনিয়ে আসছে ধূসর কুয়াশা।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত বইল একটা তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের খরগতি। আসন্ন সন্ধ্যায় প্রাগৈতিহাসিক আতঙ্কের মতো রাত্রি নামছে আরণ্যক হিমালয়ের ওপর—আকাশ জোড়া একটা প্রেত-ডানার মতো তামসী রাত্রি। সেই ভয়ঙ্কর আদিমতার রাজ্যে নির্জন গুহার সুপ্তি থেকে জেগে উঠল অরণ্য-রাজ্যের সম্রাট। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো বেত-ঝোপের ভেতরে—শিকারের সন্ধানে জ্বেলে দিলে ক্ষুধার্ত চোখের আগ্নেয় দৃষ্টি, তারপর ক্রুদ্ধ গম্ভীর গলায়—

—বাঘ, বাঘ—বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে বসতে চাইল প্রতুল।

—নার্স—উত্তেজিত চাপা গলায় ডাক্তার ডাকলেন।

জুতার দ্রুত আওয়াজ তুলে নার্স ছুটে এল।

—ভয় নেই—বাঘ নেই এখানে—ডাক্তার আশ্বাসের কোমল গলায় বললেন।

নার্স কাঁধের ওপর দুখানা স্নিগ্ধ হাত রাখল।

—আপনি শুয়ে পড়ুন—বিশ্রাম দরকার আপনার—আস্তে আস্তে নার্স আবার তার মাথাটা নামিয়ে দিলে বালিশে।

ক্লান্ত শিথিলতায় চোখ বুজল প্রতুল। দুর্বল স্নায়ুগুলো কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে রইল অসাড়তায়। মিনিট তিনেক পরে আবার ধীরে ধীরে দৃষ্টি মেলল সে।

—কবে এসেছি এখানে?—এবার খানিকটা প্রকৃতিস্থ গলায় সে জানতে চাইল।

—চারদিন!

—চারদিন! এর মধ্যে আমার আর জ্ঞান হয়নি?

—না, পুরো সেন্স আসেনি।—ডাক্তার জানালেন: কাল রাতে

অবশ্য একবার চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু চিনতে পারেননি। হঠাৎ 'বাঘ বাঘ' বলে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

বাঘ! কিন্তু ভয়ের চমকটা একাই সামলে নলে প্রতুল! না—বাঘ নেই এখানে। হাসপাতাল। নির্ভরতার নিরাপদ আশ্রয়। হিমালয়ের সে বিভীষিকা এখান থেকে অনেক দূরে। এখানে কাচের জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে রোদ পড়েছে পাশের টিপয়টার ওপর—ওষুধ, মেজার গ্লাস, ফিডিং কাপ ঝকঝক করছে সে রোদে। আর আছে মানুষের মুখ। মানুষ। আত্মীয়। সুহৃদ। অন্তরঙ্গ। আশ্বাস। প্রকৃতিজয়ী সংঘশক্তি।

খাটের একটা কোনা ডান হাতে শক্ত করে চেপে ধরল প্রতুল। যেন মুঠো করে আঁকড়ে রাখতে চাইছে আশ্রয়টাকে। তারপর ডাক্তারের দিকে কৃতজ্ঞ চোখ মেলে তাকালো।

—কে আমাকে নিয়ে এল এখানে?

—যাদের গাড়ির সামনে আপনি পড়েছিলেন—বেঁচে গেলেন এক ইঞ্চির জন্যে। প্ল্যান্টার বীরেন চক্রবর্তী। তাঁরাই তুলে এনে এখানে ভর্তি করে দিয়েছেন।

—ওই গাড়িটা তখন এসে না পড়লে হয়তো বাঘের হাতেই আমি মারা যেতাম—কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতুল বলতে চেষ্টা করল।

—কিছুনা—ওঁরা উপলক্ষ্য মাত্র—ডাক্তার বললেন, ভগবান বাঁচিয়েছেন।

ডাক্তার ঈশ্বর-বিশ্বাসী।

প্রতুল চুপ করে রইল। অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলতে চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই যেন ভালো করে গুছিয়ে উঠতে পারছেনা এখনো।

ডাক্তার বুঝলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

—এখন আর বেশি কথা বলবেননা। ঘুমিয়ে নিন—জিরিয়ে নিন একটু। আজ তো বেশ ভালোই আছেন, বিকেলে আলাপ করা যাবে এখন। তা হলে উঠি—কেমন ?

আবার এক ঝলক প্রসন্ন আশ্বাসের হাসি বিলিয়ে বিদায় নিলেন ডাক্তার।

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। সত্যি—এই কটা কথা বলতে গিয়েও ক্লান্তি বোধ করছে সে। চারদিন! চারদিন ধরে এই হাসপাতালে এমনি ভাবে পড়ে আছে সে!

নিজের জগৎটা ক্রমে একটু একটু করে বিস্তৃত হতে লাগল তার। আচ্ছন্নতার আড়ালটা সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে দেখা দিলে সমগ্রতার স্বরূপ।

নীরা—খরনয়না জুনো; কর্ণাভরণ থেকে শুভ্র সুন্দর গালের ওপর রক্ত-প্রবালের নিষ্ঠুর দীপ্তি—কাচের গ্লাস ভেঙে পড়বার মতো ধারালো হাসির ঝলক। সবজান্তা অধ্যাপক দে—পৃথিবীর মূর্খ নির্বোধ মানুষগুলোর প্রতি সঞ্চিত ঘৃণায় ভ্রূ-যুগলে গোটাকয়েক কুঞ্চনরেখা। ইন্‌সিয়োরেন্সের দালাল চক্রবর্তী—সিগারেট কেসে চার রকম সিগারেট রাখাই যাঁর বিলাসিতা! স্বর্ণগর্দভ ব্রজেনবাবু—তাঁর স্থূলাঙ্গিনী স্ত্রী—

হঠাৎ এক অসহ্য ঘৃণা তার শরীরে বিষের মতো জ্বলে যেতে লাগল। কেন—কী দরকার ছিল? কেন সে অপূর্বের কথায় এমন ভাবে পা বাড়ালো একটা বিজাতীয় জগতে—হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার পরিবেষ্টনে? অভাব? অভাব তো বরাবরই ছিল। শিল্পের মধ্য দিয়ে সুন্দরকে যে জানতে চেয়েছে—কোন্ কালে এর চেয়ে বেশি মূল্য জুটেছে তার? ক্ষুধার আশীর্বাদ নিয়েই ছবি এঁকেছে সারা পৃথিবীর রূপকারের দল। অনাহারের তীব্র জ্বালা নিয়ে কারো হাতে মায়াময় হয়ে উঠেছে 'নীল

শব্দে'র সমারোহ—ক্ষুধিত কেউবা পাকা আপেল আর রসালো আঙুরের উপচার সাজিয়েছে রঙের জাদুতে।

"In the nightmare of a haunted city—
I see your pale face—Death take its toll
But still your closed eyes speak of the light :
Of life, of colour—of—"

মনে আসছেনা—কিছুতেই মনে আসছে না বাকীটা। "of life of colour—"রঙ—জীবন। জীবনের রসায়ন, রূপায়ন, দীপায়ন! মৃত্যু তার পাওনা মিটিয়ে নিক, তবু জীবন, প্রেম, স্বপ্ন। মৃত্যুহীন—চিরঞ্জীব!

বাকী লাইনগুলো এলোমেলো ভাবনার মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ। তারপর কোথা থেকে অর্থহীন, সঙ্গতিহীন কতগুলো হরফ ছিটকে পড়তে লাগল চোখের সামনে। একসঙ্গে জড়ো হল তারা, ঘন হতে লাগল—একটার ওপর আর একটা এসে জমতে লাগল, তারও পরে কালিঢালা একটা পাতার মতো লেপটে গেল প্রতুলের চোখের পাতার ওপর।

নিমজ্জিত চেতনার ওপর দিয়ে বয়ে চলল অন্ধকারের খরস্রোত।

—জেগেছেন?

কয়েক মুহূর্ত? না—কয়েক ঘণ্টা। ঘরের ভেতরের উজ্জ্বল শাদা আলোটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। জানলার বাইরে পৃথিবীটা যেন এক নিঃশ্বাসে ঘণ্টা কয়েক এগিয়ে গেছে।

দিনান্তের আরক্তিম লজ্জায় সোনালি হয়ে গেছে টিপয়ের শিশি-গেলাস-ফিডিং কাপ।

—দুধটা খান—

নার্স বলছে। আত্মসমর্পণের অসহায়তায় ফিডিং কাপটা হাতে নিলে প্রতুল।

—জল?

কাচের গ্লাসটা ধরেছে মুখের সামনে। শ্যামল, শীর্ণ একখানি হাত। রূপ নেই, কিন্তু একটা করুণ স্নিগ্ধতা। মা-কে মনে পড়ে।

হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল মনে হল নিজেকে।

—নার্স?

—বলুন?

—কতদিন আর এভাবে থাকতে হবে আমাকে?

নার্স হাসল—সহিষ্ণুতার অনুশীলিত হাসি।

—সে তো আমি ঠিক বলতে পারব না। ডাক্তার যা বলবেন, তাই হবে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, আরো দিনতিনেক হয়তো থাকতে হবে আপনাকে।

—আরো তিনদিন?—প্রতুলের স্বরে অসহায়তা।

—কী করা যায় বলুন? 'শক'টা তো সামলে নিতে হবে!

—না, আজই আমি যেতে চাই। আজই আমায় ফিরে যেতে হবে কার্শিয়াং—প্রতুল উত্তেজনায় আবার বিছানার ওপর উঠে বসতে চাইল।

—যাবেন, যাবেন, ব্যস্ত কেন? সময় হলে ব্যবস্থা আমরাই করব নার্স আর প্রতুল একসঙ্গেই তাকালো। ডাক্তার ঘরে ঢুকেছেন—আশ্বাসের বাণীটা উচ্চারণ করেছেন তিনিই।

—উঃ, হোপলেস্!

প্রতুল বিছানায় এলিয়ে পড়ল। বিকেলের আলোয় আশ্চর্য সুন্দর প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন তার বেডের পাশে।

## আট

—বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে বাড়ি? কত নম্বর বললেন?—ডাক্তার শচীন মজুমদার চমকে উঠলেন: আমার ভুলও হতে পারে অবশ্য। কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে ওই বাড়িতে ভূপেন থাকত না? মানে, ভূপেন চাটুয্যে?

এবার প্রতুলের চমক লাগবার পালা।

—আমার বাবাকে চিনতেন নাকি আপনি?

ডাক্তার সে কথার জবাব দিলেন না। উত্তেজনায় আরক্ত মুখে বললেন, তুমি তবে ভূপেনের সেই ছেলে? নাইন্‌টিন থার্টি থ্রিতে শেষবার আমি ও বাড়িতে যখন যাই, তখন বছর দশেকের একটা বাচ্চাকে দেখেছিলাম বটে। তুমি তবে সেই?

নির্বোধ দৃষ্টি মেলে শুনতে লাগল প্রতুল।

—ভালো করে তাকাও আমার দিকে। ছাখো তো কিছু মনে পড়ে কিনা।

অসুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে ডাক্তারের পনেরো বছর আগেকার মুখখানা কল্পনা করতে চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল না—অনেকগুলো সম্ভব-অসম্ভব হারিয়ে যেতে লাগল দেখা দিতে না দিতেই। ডেভেলপারে ওভার-এক্সপোজড্ ছবির মতো। চেতনার পটে রেখা নিয়ে ফুটে উঠতে না উঠতেই কালো হয়ে গেল—একাকার হয়ে গেল অন্ধকারে।

—তোমার তখন বছর দশেক, কাজেই ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়—মানস-মন্থনের দুঃখসাধ্য প্রচেষ্টা থেকে শচীন নিজেই মুক্তি দিলেন

প্রতুলকে : ভুপেন শুধু আমার সহপাঠী ছিল না, পরম বন্ধুও ছিল। আর তারই ছেলে তুমি—এখানে—এভাবে, কী আশ্চর্য !—শচীন থামলেন। এমন আশ্চর্য হবার পরে আরো কিছু যে বলবার থাকতে পারে, সে কথা ভেবেই পেলেন না সম্ভবত।

কী করা উচিত প্রতুলের ? উঠে পায়ের ধূলো নেওয়া ? খুব সম্ভব। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে কাঁধের ওপর স্বচ্ছন্দে বয়ে নিয়ে চলা মাথাটার যে একটা নিজস্ব ভার আছে এবং সে যে কত গুরুভার আপাতত তা অনুভব করছে সে। ওয়ান থার্ড অব দি বডি নয়—মণ কয়েক শিসার মতো তার ওজন; তাই সে উঠল না, প্রণামও করল না। শুধু নিঃশব্দে আত্মসমর্পণের অসহায়তায় তাকিয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে একটানা দৃষ্টি ফেলে রাখায় তার চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগল—তবু কিছুতেই সে দুটোকে সে বুঁজতে পারল না।

—আশ্চর্য যোগাযোগ !—ডাক্তার আবার স্বগতোক্তি করলেন।

প্রতুলের চিন্তাটা অদ্ভুতভাবে তরল হয়ে এল। হয়তো মস্তিষ্কের অসংলগ্ন অবস্থাটা—অবচেতনার মধ্যে পাহাড় কাঁপানো বাঘের গর্জন, হয়তো চীনে মাটির ঝকঝকে ফিডিং কাপটার ওপরে জল মেশানো রক্তের মতো রোদের রঙ—সব একসঙ্গে মিশে সামঞ্জস্যহীন ঐকতান রচনা করল একটা। আশ্চর্য যোগাযোগ ! ডাক্তারের গুন্ গুন্ করে বলা কথাটা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ সুরু করল তার মন। যোগাযোগ শব্দটা যখন অভিধানে আছে তখন আশ্চর্য হওয়ার সুযোগ কই ? কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির মাঝখানে কি এত বড় একটা পৃথিবী আমের বিকীর্ণ হয়ে আছে যে বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের বাড়ি থেকে এই হাসপাতাল নিছক অবিশ্বাস্য ঘটনা ? আর অ্যাকসিডেণ্ট জিনিষটা কি এতই বিরল যে সে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে ছিটকে পড়েছে ?

শচীন বললেন, বিপদ কেটে গেছে, এখন দরকার বিশ্রাম আর সেবা। কিন্তু ভূপেনের ছেলে হয়ে এই হাসপাতালের খাটে পয়সা দেওয়া সেবা নেবে এ হতেই পারেনা। আজ বিকেলেই আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।

যেখানে ব্যবস্থা হল, তার পাশে একটা মস্ত খোলা জানলা। হিমালয়ের হিংস্র প্রত্যক্ষ রূপ ছবির পশ্চাৎপটের মতো দিগন্তে আঁকা হয়ে আছে সেখানে। রাত্রে তার ভেতর দেখা যায় সোনালি ময়ালের তির্যক গতি—দাবানল জ্বলছে। আর দেখা যায় মহতোমহীয়ান কাঞ্চন-জঙ্ঘাকে: সকালে হিরণ্যদ্যুতি, দুপুরে মুক্তাদীপ্ত, দিনান্তে একরাশ রক্ত জবার পাঁপড়ি ঝরে ঝরে যায় অন্ধকারের মধ্যে।

আর একখানা হাত পড়ে কপালের ওপর।

শঙ্খ-শুভ্র তার রঙ, পাকা আঙুরের মতো ঈষদুষ্ণ অনুভূতি জড়ানো তার আঙুলে। সে হাত সুজাতার। শচীনের ছোট মেয়ে। কলকাতা থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে বাবার কাছে।

সুজাতা বললে: আপনার বাঘ অনেক দূরে। নির্ভয়ে একবার উঠে বসুন দেখি।

ঘন কালো চোখের দৃষ্টিতে যেন নিবিড় একটা ইচ্ছাশক্তি লুকিয়ে আছে সুজাতার। সে ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণ প্রতুল রোধ করতে পারল না। বালিশে পিঠ দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

—কাকাবাবু কোথায়?

—হস্পিটালে। কিছু দরকার আছে?

—না, এম্নি।—প্রতুল ক্লান্তভাবে নিজের মধ্যে কথা খুঁজতে লাগল: আপনাদের ভারী কষ্ট দিলাম।

—তা দিলেন।—সুজাতা হাসল: কিন্তু যেহেতু কষ্টটা আপনি নিজেই বেশি পেয়েছেন সেইজন্যে অপ্রতিভ হবার কোনো দরকার নেই।

মুহূর্তের জন্যে ভ্রূকুঞ্চিত করল প্রতুল। নীরার প্রতিধ্বনি শুনল নাকি?

না, নীরা নয়। শঙ্খ-শুভ্র হাতের নিটোল আঙুলগুলোতে নেল্ পালিশের রক্তগ্লানি নেই। গালের ওপর আভরণের নিষ্ঠুর দীপ্তিটা কোথাও পড়েনি। চোখের দৃষ্টিতে পিঙ্গল চঞ্চলতা নেই—দূরের পাহাড়-গুলির মতো ঘন গম্ভীর নীলাঞ্জন সঞ্চিত হয়ে আছে সেখানে।

—চা খাবেন একটু?

—না।

—বইপত্র পড়বেন কিছু?

—ভালো লাগছে না।

সুজাতা দমল না। সপ্রতিভ হাসি হাসল আবার।

—তাই তো, কী করে 'রিলিফ্' দেওয়া যায় আপনাকে? দাঁড়ান—রেডিয়োতে বোধ হয় রবীন্দ্র সঙ্গীত আছে এখন। খুলে দিচ্ছি।

প্রতুল কিছু বলবার আগেই উঠে গেল সুজাতা। পাশের ঘর থেকে রেডিয়োর সুইচ খোলবার আওয়াজ কানে এল। তারপর আরো কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে গেলে ঘর ভরে উঠল গানের গুঞ্জনে:

'একলা বসে হেরো তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বাসন্তী রঙ্ দিয়া'—

সুজাতা ফিরে এল। বসল বিছানার পাশের চেয়ারটায়।

—ভালো লাগছে এবার?

—হাঁ, বেশ লাগছে।—ভদ্রতা করে বলতে গিয়েও প্রতুল অনুভব করল সত্যিই ভালো লাগছে গানটা। মনের এই ক্লান্ত পীড়িত অবস্থায়

যেন এমনি একটা কিছুরই দরকার ছিল। বিরাম, বিশ্রাম। কিছু মন্থর অলস স্বপ্ন।

কিন্তু এই মেয়েটিকেও মন্দ লাগছে না এই মুহূর্তে। দৃষ্টিতে গভীর কৃতজ্ঞতার আবেশ নিয়ে প্রতুল সুজাতার দিকে তাকালো। সকালের রুপোলি রোদ পড়েছে মেয়েটির মুখের এক পাশে। চমৎকার প্রোফাইল্। যে কোনো শিল্পীর লোভ জাগবে আড়ালে লুকিয়ে একটুকরো স্কেচ্ টেনে নিতে। ইচ্ছে করতে লাগল ওই গানের মতো বাসন্তী রঙ দিয়ে সেও একখানা ছবি এঁকে দেয় মেয়েটির।

প্রতুলের চোখে চোখ পড়তে মুখ ঘুরিয়ে নিল সুজাতা। এক টুকরো খবরের কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সেটাকে অন্যমনস্কভাবে জড়াতে লাগল আঙুলে। তারপর:

—আপনি তো আর্টিস্ট্, না?

—ঠিক আর্টিস্ট্ কিনা জানিনা। তবে ছবি আঁকি।

—আমারও ছবি আঁকা শেখবার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাবা কিছুতেই আর্টস্কুলে পড়তে দিলেন না।

—কী হত আর্টস্কুলে পড়ে? ছবির কতকগুলো গ্রামার শিখতেন এই যা।—প্রতুল ক্লান্ত, বিস্বাদ হাসি হাসল।

গান বন্ধ হয়ে গিয়ে বেতারে কী এক নেতার বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। সুজাতা বললে, একটু দাঁড়ান।—চঞ্চল পায়ে উঠে গিয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে সে ফিরে এল নিজের জায়গায়।

—হাঁ, কী বলছিলেন? শুধু গ্রামার শেখায় আর্টস্কুলে? কিন্তু গ্রামারেরও তো একটা দাম আছে।

—ঠিক জানিনা।—প্রতুল ভ্রূকুঞ্চিত করল: আগে ভাষা গড়ে ওঠে, তারপরেই জন্ম দেয় তার ব্যাকরণ। ছবির জন্যে নতুন ভাষ্য

যারা গড়বে—গ্রামারটা তাদের জন্য নয়। ভাষা তৈরী হলে তবে তো ভাষ্য!

—আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমিও যে ঠিক বোঝাতে পারছি তা নয়—প্রতুল বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসল আধশোয়া ভঙ্গিতে: মনে হয় বাঁধা একটা শেখানোর প্রণালীর মধ্যে চিন্তাটা আমাদের থেমে যায়—অন্য কোনোভাবে দেখবার চোখকেই আমরা হারিয়ে ফেলি। নতুন ফর্ম যে আবিষ্কার করবে তার দৃষ্টিটা একেবারে স্বচ্ছ থাকাই ভালো—তার ওপর কোনো কিছুর ছাপ না থাকাই উচিত।

যুক্তির মধ্যে ফাঁক আছে প্রতুলের—এর অনেকগুলো কথারই প্রতিবাদ করতে পারত সুজাতা। বলতে পারত, অন্তত প্রচলিত নিয়মের ধারণাটা না এলে নতুন সৃষ্টির ভিত্তিটা দাঁড়াবে কিসের ওপর? তা হলে তো আবার হটেন্টট্ বুশ্‌মেন আর্ট থেকে শুরু করতে হয়!

কিন্তু সুজাতা আর কোনো জবাব দিলে না। কিছু বলবার জন্যই কথা শুরু করেছিল, তাই আলোচনাটা মাঝ পথেই থেমে গেল। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে।

—কী মনে হয় আপনার?—প্রতুল জানতে চাইল।

—কী আর মনে হবে?—এবারে সুজাতার স্বরও যেন ক্লান্ত শোনালো: অপঠিত পাণ্ডিত্য নিয়ে অরিজিন্যাল ফর্ম গড়ে তোলার কাজ আপনাদের মতো প্রতিভাবানদের, আমাদের নয়। সুতরাং এ জন্মে আমার আমার আর আর্টিস্ট্ হওয়া হল না। সে যাক—আপনার জন্যে এক কাপ চায়েরই যোগাড় দেখি আমি।

—বললাম তো, আমি এখন চা খাবনা।

—আমি খাব।

—বেশ তো থাননা—প্রতুল হাসল।

—তা হলে থাক—সুজাতা বললে, একা চা খাওয়ার জন্যে এখন আর খাটবার উৎসাহ নেই আমার।

—নাঃ, আপনার সঙ্গে পারা মুস্কিল!—স্নেহভরে প্রতুল বললে, তা হলে আমার জন্যেও করুন।

খুশি হয়ে বেরিয়ে গেল সুজাতা।

আরো দুদিন। কাটল পিতৃবন্ধু শচীনবাবুর যত্নে এবং সুজাতার সেবায়, কেটে গেল রোগশয্যার যতিতে। তৃতীয় দিনের বিকেলে প্রতুল আস্তে আস্তে নেমে এল বাইরের ছোট কম্পাউণ্ড্‌টিতে।

শচীনবাবু্‌ সাইকেল নিয়ে 'কলে' বেরুচ্ছিলেন। গেটের বাইরে থেকে একবার পিছন ফিরে তাকালেন।

—একটু ভালো আছে তো আজ? যাওনা—আরো দুপা এগিয়ে একটু হেঁটে এসো। সামনেই মহানন্দা—বেশ প্লেজেণ্ট্‌ নদীর ধারটি। রিফ্রেশড্‌ বোধ করবে।

প্রতুল বেরিয়ে এল। টুকরো ছোট মাঠ পেরিয়ে এগোল নদীর উদ্দেশ্যে।

—প্রতুলবাবু্‌!

পেছন থেকে সুজাতার ডাক। দাঁড়িয়ে পড়ল।

দ্রুতপায়ে সামনে এল সুজাতা।

—বারে। পালাচ্ছেন কোথায়?

—পালাবার জো আছে নাকি? যে রকম কড়া নজর আপনার! একটু বেড়াতে যাচ্ছিলাম নদীর দিকে।

—এর মধ্যেই নদীর খবর পেয়ে গেছেন! আর্টিস্ট্ই বটে।—সুজাতার চোখ কৌতুকে চকচক করে উঠল: কিন্তু বড় যে সাহস করে একা একা যাচ্ছেন?

—কেন, ভয়টা কিসের?

—বাঃ, নদীর খবর রাখেন, আর নদীর ধারে যে বাঘ আছে সে সংবাদটা বুঝি এখনো পাননি?

বাঘ! মুহূর্তের জন্যে সমস্ত শিরাগুলো চমকে উঠল প্রতুলের—মুখের উপর দিয়ে ভয়ের পাণ্ডুর ছায়া দুলে গেল। ঠিক দক্ষিণ দিকেই হিমালয়ের অরণ্যক গিরিবাহু প্রসারিত। আচম্কা মনে হল, ওখান থেকে অনুসরণ করতে করতে এখানেও মৃত্যু তার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা বর্ণহীন হাসি হাসল প্রতুল।

—সত্যি বলছেন বাঘ আছে?

—বাঘ কি আর মিথ্যে করে থাকে?—প্রতুলের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ বোধ করল সুজাতা: তবে ভয় নেই, সব আমার পোষমানা। আমি সঙ্গে থাকলে কেউ আপনার কাছে আসতে ভরসা পাবেনা।

ঠাট্টা। অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল প্রতুল। কিন্তু মস্তিষ্কটা যথেষ্ট সুস্থ হয়ে ওঠেনি এখনো। এখনো চেতনার ভেতর একটা অমানুষিক ভয় জমাট হয়ে আছে এক পিণ্ড অন্ধকারের মতো। সে অন্ধকারের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে একটা কালো মুঠি বেরিয়ে এসে এখনো তার গলাটাকে টিপে ধরতে চায়!

প্রতুল বললে, তবে আপনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

—হাঁটতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না?

—না, বেশ ভালোই লাগছে।

বেশিদূর যেতে হল না। একটা ছায়াভরা আমবাগান পেরুতেই দেখা গেল পথটা ক্রমশ ঢালু হয়ে একেবারে নদীর কোলে গিয়ে নেমেছে। বালির চড়ার ভেতর দিয়ে শীর্ণকায় নদী। এখানে ওখানে দু একটা বাব্‌লা গাছ আর নাগকেশর ফুলের ঝোপ, দক্ষিণে শ্যামকৃষ্ণ হিমালয়ের প্রাকার, বাঁ দিকে বালির চরের দীর্ঘ রেখা নদীর জলের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে চলতে চলতে শূন্যতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চারদিকে বিবিক্ত শান্ত বিকেল।

শচীনবাবু একে প্লেজেণ্ট বলে ছিলেন। কিন্তু প্রতুল অনুভব করল মহানন্দার এই স্তব্ধ নির্জনতা চোখকে আচ্ছন্ন করে না, মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। শূন্যতাই এর রূপ—তাই কোনো বিশেষ রূপ দৃষ্টিকে আড়াল করে ধরে না; একটা অপর্যাপ্ত বিস্তৃত পটভূমি একখানা শাদা ক্যান্‌ভাসের মত মনের সামনে ফেলে দেওয়া আছে, ইচ্ছে মতো রং ফলানো যায় তার ওপরে। মহানন্দার একটা বিশেষ রূপের মধ্যে ধরা দিতে হয় না—নির্বিশেষ ভাবনাগুলো কোনো অফুরন্ত আকাশে রাশি রাশি হাল্‌কা মেঘের মতো খেলার খুশিতে ভেসে যেতে পারে।

—বসবেন একটু?—সুজাতা জানতে চাইল।

—হাঁ, বসলে মন্দ হয়না।—প্রতুল এতক্ষণে টের পেলো মাত্র দিন এইটুকু হেঁটে আসতেই রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে। এই পাঁচ দিন বিছানায় শুয়ে থেকেই যেন ছ মাসের শ্রান্তি এসে ঘিরে ধরেছে তাকে।

মিহি ঝুরঝুরে বালির ওপর পাশাপাশি বসে পড়ল দুজন।

—বেশ নিরিবিলি, না?—সুজাতা কৌতূহলহীন প্রশ্ন করল।

—হাঁ, খুব নিরিবিলি। শহরের লোক বেড়াতে আসেনা এখানে ?

—কালেভদ্রে।—সুজাতা মৃদু হাসল : লোকের সময় কোথায় বলুন ? কাঠ আর চায়ের ব্যবসার জায়গা এটা। সময় নষ্ট করার মতো সময় এখানে কারুর নেই।

—দুর্ভাগ্য।—সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল প্রতুল।

—দুর্ভাগ্য কেন বলছেন ? দুঃখের সৃষ্টি অভাবের বোধ থেকে। সে অভাবটাই যারা অনুভব করে না, তাদের জন্যে কেন মিছিমিছি সহানুভূতির অপচয় করবেন ?

ঠিক। নিজের অভিশপ্ত উর্বশীর কথা মনে পড়ল। কত বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন-তপস্যা আগরওয়ালার ক্যালেণ্ডারের কষ্টিপাথরে পড়ে এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল। কিন্তু কতটুকু ক্ষতি হয়েছে আগরওয়ালার ? তার কাপড় আর ছোট এলাচের ব্যবসায় এক বিন্দু বাধা পড়েনি কোথাও। দূর সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে যন্ত্রণাভরা ব্যাধির হাতে যখন গঁগ্যার শেষ স্পন্দনটি থেমে আসছে—সে সময় পৃথিবীর কোনো ঘড়ির কাঁটা এক সেকেণ্ডের জন্যেও তো থেমে দাঁড়ায়নি।

মাথার ওপর দ্রুতগামী কলধ্বনি শোনা গেল। সুজাতা তাকালো আকাশের দিকে।

—দেখেছেন, হাঁস চলেছে। লালশরের ঝাঁক মনে হচ্ছে।—প্রজাপতির পাখার মতো বিচিত্র একটা রেখাব্যূহ রচনা করে লালশরের দল মহানন্দা পার হয়ে উড়ে গেল। শুধু তাদের পাখার শব্দ অনেকক্ষণ ধরে যেন থেমে রইল চারদিকে ; যেন এই মাটি, জল, আর শূন্যতার বুকে একটা বিরাট তারযন্ত্র এলিয়ে পড়েছিল, তারই তারগুলো ওই শব্দের মীড়ে ঝিন্ ঝিন্ করে কাঁপতে লাগল।

আর ওই শব্দেই যেন অনেকদিনের ঘুমে ঢাকা মনটা নাড়া খেয়ে জেগে উঠল প্রতুলের।

—শুনুন, আপনাদের তো অনেক বিরক্ত করা গেল। প্রাণ যখন বাঁচিয়েছেন, তখন ধন্যবাদের কথা তুলব এমন বর্বর আমি নই। কিন্তু আর থাকবার উপায় নেই আমার—কালই আমাকে কার্শিয়াঙে চলে যেতে হবে।

—কাল! সুজাতা যেন অস্বাভাবিক চমক খেল একটা—অসতর্ক নিশ্চিন্ত পাখির বুকে ছর্‌রা এসে বিঁধবার মতো কথাটা তাকে আঘাত করল। হয়তো বাড়ি ফিরে, চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে ঠিক এই কথা বললে এমন বিশ্রী লাগত না—মনে হত সঙ্গত, মনে হত এখন তার ফিরে যাওয়াই স্বাভাবিক! কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে—মহানন্দার এই বৈকালী শূন্যতায় ঝুরঝুরে বালির ওপর পাশাপাশি বসে এটাকে একটা হৃদয়হীন অবমাননার মতোই মনে হল যেন।

—হাঁ, কালই আমায় যেতে হবে। ওদিকে কতদূর কী গণ্ডগোল হয়ে বসে আছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ওঃ!—সুজাতার মুখের কোমল লাবণ্য মিলিয়ে গেল, এক মুঠো বালি সে চেপে ধরল শক্ত করে। তারপর হাঁস চলে-যাওয়া আকাশের শূন্যপথের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে দৃষ্টিকে সে নামিয়ে আনল হিমালয়ের ওপর: বেশ তো, যাবার দরকার হলে তাই যাবেন।

এবারে খোঁচাটা প্রতুলের গায়ে খচ্ করে গিয়ে বিঁধল। এত সহজে এমন অবলীলাক্রমে রাজী হয়ে গেল সুজাতা? সে কি সত্যসত্যিই এমন একটা ভার হয়ে উঠেছিল যে চলে গেলে মনের দিক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে ওরা? একটা দিন, অন্তত একটা দিনও কি ওকে থাকবার জন্যে অনুরোধ করতে পারত না সুজাতা?

মহানন্দার শূন্য দিগন্তটা যেন মেঘে থম থম করে উঠল। যেন একটা আকস্মিক গুমোটের ধোঁয়ায় বন্ধ হয়ে এল সহজে নিশ্বাস ফেলবার বাতাসটুকুও।

প্রতুলই শেষ পর্যন্ত বললে, এবার ফেরা যাক চলুন।

—তাই চলুন—সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা।

ফাঁকা আকাশে অনেকখানি রং ফলাবার সুযোগ ছিল আজ—অনেক মেঘকে রঙীন করে দেওয়া যেত। কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। ছেলে মানুষের মতো রঙের পাত্র উল্‌টে ফেলে উঠে পড়ল দুজনে—ভারী পা বাড়ির দিকেই ফিরে চলল।

## নয়

ডাক্তার শচীন কোনো কথাই ভাবলেন না।

—যাওয়াই তো উচিত। ওঁরাও ওখানে কত দুশ্চিন্তা করছেন কে জানে!

ওঁরা দুশ্চিন্তা করছেন! একটা কঠিন কৌতুকের হাসি ফুটে উঠতে চাইল প্রতুলের মুখে। দুশ্চিন্তা করবার পৃথিবী সে নয়। সেখানে অধ্যাপক দে আছেন, ইন্সিয়োরেন্সের চক্রবর্তী আছেন, আছে খরহাসিনী নীরা। রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়।' সেখানে উর্বশীর চোখে জল দেখা দেয়না কোনোদিন। সেখানকার মেনকার নাচের নূপুরে কখনো তালভঙ্গ হয়না। তাই অত সহজেই তাকে মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দিয়ে তারা সরে পড়তে পেরেছে, তার জন্যে একটি রাতেও তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার কথা নয়।

—হুঁ।—শচীনবাবুর কথার উত্তরে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সে।

—একটা চিঠি দিয়ো আমাদের—শচীন আবার বললেন।

—নিশ্চয় দেব। যেভাবে আপনারা আমার প্রাণ বাঁচালেন—

শচীন ভ্রূভঙ্গি করলেন।

—প্রাণ বাঁচানো আবার কী? ভূপেনের ছেলে তুমি—ভদ্রতা করছ নাকি আমার সঙ্গে?

—আর করব না।—বিষণ্ণ শীর্ণ হাসি হাসল প্রতুল: ক্ষমা করুন।

শচীনও হাসলেন, যাক, কার্শিয়াঙেই তো রইলে। কখনো-সখনো এসে দেখা কোরো, খুব খুশি হবো।

—আসব, নিশ্চয় আসব।

কিন্তু সুজাতাকে একবার পাওয়া দরকার। কাল থেকে কী যেন হয়েছে তার। ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। চারদিন ধরে সেবা-যত্নের মাধুর্যে ভরে দিয়ে হঠাৎ অসহযোগ করেছে সুজাতা।

সুজাতাকে দেখা গেল বাইরের ছোট কম্পাউণ্ডটিতে। সকালের আলোয় ভিজে চুল মেলে দিয়ে চুপ করে বসে ছিল। কোলের ওপর একটা এম্ব্রয়ডারী। প্রজাপতির পাখায় রঙ ফলাতে ফলাতে কী মনে করে থেমে গেছে মাঝপথে। হয়তো মন ভুলিয়ে নিয়ে গেছে পৃথিবীর রঙ্।

—শুনুন?—ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল প্রতুল।

—বলুন?—উৎসাহহীন শান্ত চোখ তুলে ধরল সুজাতা। যে চোখের দিকে তাকালে মন আচমকা স্তব্ধ হয়ে যায়—ধারণা হয় নিজেকে অবাঞ্ছিত বলে। কারো নিভৃত মুহূর্তে অনধিকার প্রবেশের সংকোচ এসে দাঁড়ায়, স্পর্শ করে ধ্যানভঙ্গের অপরাধ।

দ্বিধা করে প্রতুল বললে, আজ বিকেলে ফিরে যাচ্ছি।

সুজাতা চোখ নামিয়ে নিলে। অলস আঙুলে কাজ শুরু করলে তার এম্ব্রয়ডারীতে। তারপর মৃদু নিশ্বাসের মতো কথাটাকে ছেড়ে দিলে, জানি।

ব্যাস, ফুরিয়ে গেল। আর কিছু বলবার নেই। আর বিরক্ত করবার কোনো মানে হয়না। মুখের সামনে কোথায় সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল একটা। এই বার যে পথে এসেছিল সেইপথ দিয়েই তার ফিরে যাওয়া উচিত।

প্রতুল তবু নড়ল না।

—আবার শিলিগুড়িতে আসব কদিন পরে।

মুহূর্তের জন্যে সুজাতা চোখ তুলল, মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি হয়তো আলো হয়ে উঠল তার। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে তন্ময় হয়ে যেতে চাইল প্রজাপতির পাখায়ঃ আপনার খুশি।

দরজাটা যেন খুলে যাচ্ছে আবার। মনে মনে কেমন একটা ভরসা পেল প্রতুল। ধ্যানের অতল থেকে জেগে উঠছে সুজাতা।

—আপনি নিশ্চয় রাগ করেছেন আমার ওপর।

—মিথ্যে রাগ করতে যাব কেন? অসুখে পড়ে এসেছিলেন—সেরে গেল, চলে যাচ্ছেন। রাগ করবার কী আছে এতে?

—তা জানিনা। কিন্তু এটা জানি রাগ আপনি করেছেন।

সুজাতা এবার হাল ছেড়ে এম্ব্রয়ডারী নামিয়ে রাখল। মুখে দেখা দিল বিদ্রোহের আভাস।

—যদি রাগ করেই থাকি, তাতে আপনার কী?

প্রতুল হেসে উঠলঃ বাঃ, এ তো মন্দ লজিক নয়। রাগ করবেন আমার ওপর, বলবেন আমার কী? দিনরাত সেবা করেছেন; মরতে যাচ্ছিলাম—বাঁচিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার ঋণ তো শোধ হলই না, আবার রাগের পাপটাও বয়ে নিয়ে যাব নাকি কাঁধের ওপর?

—ভয় নেই, সেজন্যে নরকে যেতে হবেনা আপনাকে।

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। কিন্তু বাজে কথা থাক। কেন রাগ করেছেন তা আর জানতে চাইব না। শুধু বলুন তো কী হলে আপনি খুশি হন?

—আমি খুশি হলে আপনার কী লাভ?—আবার সুজাতার পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টি প্রতুলের মুখের ওপর পড়ল। কিন্তু সে দৃষ্টির মধ্যে প্রতুল যেন আকাশ দেখতে পেল এবার। আদিগন্ত। সে দৃষ্টিতে রাত্রির মতো একটা বিপুল কৃষ্ণতা ঘনিয়ে এসেছে, আর অসংখ্য অজানা নক্ষত্রের বিস্ময়ের মতো রেণু রেণু মন ঝিকমিক করছে তার ওপরে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সুজাতার দৃষ্টির আকাশে দিশেহারা হয়ে রইল প্রতুল—মগ্ন হয়ে রইল সেই পুঞ্জ পুঞ্জ নাক্ষত্রিক বিস্ময়ে। বুঝেছে, আভাস পেয়েছে। যে কথা মুখে বলেনি, মুখে বলবার সময় আসন্ন হয়নি—দৃষ্টি-আকাশের তারায় তারায়, তারে তারে তার মীড় শুনতে পেল প্রতুল। কিছুক্ষণ নীরবে দুজনের দিকে দুজনের মন মগ্ন হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ দৃষ্টি নামাল সুজাতা। প্রতুল ভালো করে দেখতেও পেলনা, অশ্রু-বাষ্পের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে সেই আকাশে।

তারও পরে অনেক দূর থেকে নিজের গলার স্বর সে শুনতে পেল।

—আমি আবার আসব। সত্যি বলছি, আবার আসব।

সুজাতা কথা বললে না। নিঃশব্দে একবিন্দু জল গড়িয়ে পড়ল গালে। স্পষ্ট স্বীকারোক্তির কোথাও কিছু অবশিষ্ট রইলনা আর। স্বাভাবিক নিয়মে যে বাঁধ ভাঙতে মাসের পর মাস কেটে যেত, মাত্র একটি আঘাতে তা স্রোতে ভেসে গেল।

মনের মধ্যে যা কিছু অচেতন হয়েছিল—জেগে উঠল ঘুম থেকে। চক্ষের পলকে মিথ্যে হয়ে গেল যা কিছু ভয়-সন্দেহ, আকস্মিকভাবে মিলিয়ে গেল নীরা ; হিমালয়ের ভয়ঙ্কর নীল রেখাটা চকিতের মধ্যে সৌন্দর্যে যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, কালো অরণ্য রঙীন প্রজাপতির মতো ডানা মেলল সারা আকাশে।

প্রতুল ঘাসের ওপর বসল সুজাতার পাশে। পাকা আঙুরের মতো ঈষৎ তপ্ত আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, আসব, আবার ফিরে আসব আমি।

সুজাতার হাতখানা থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু মাত্র এক

মিনিটের জন্যে। তারপরেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ এল একটা।

*     *     *     *

বাগানের লার্কস্পার গুচ্ছের সামনে দাঁড়িয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল নীরা।

—আপনি ?

—কেন, কী মনে হচ্ছে আপনার ?

নীরা থতমত খেয়ে গেল। হাত থেকে জিনিয়াটা খসে পড়ল মাটিতে।

—আমরা ভেবেছিলাম—নীরা নিজের নার্ভাস্‌নেসটা কাটাতে চাইল : ভেবেছিলাম—

—আমি বাঘের পেটে চলে গেছি, তাই নয় ?—প্রতুল বিষাক্ত হাসি হাসল : আপনাদের রোমাঞ্চিত করে তুলবার সে সুযোগটা দিতে পারলামনা বলে আন্তরিক দুঃখিত আমি।

নীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আকস্মিকভাবে মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কী একটা কথা বলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, বলতে পারছে না। শুধু অস্থির আঙুলে লার্কস্পারের পাঁপড়ি ছিঁড়ে চলেছে।

—বাড়ির সব কোথায় ? কাউকে তো দেখছিনা।

—সবাই বেড়াতে বেরিয়েছেন—নিষ্প্রভস্বরে নীরা বললে, কেউ নেই বাড়িতে। আমার একটু সর্দিজ্বর হয়েছে বলে—

কিছুক্ষণ স্তব্ধতায় কাটল। তারপর পাংশু মুখে নীরা বললে, কিন্তু একটা কাণ্ড হয়ে গেছে যে !

জিজ্ঞাসাভরা তিক্তদৃষ্টিতে প্রতুল তাকাল।

—সবাই ভেবেছিলেন, এতদিনে যখন আপনি ফিরে এলেন না,

কোনো খবরও এল না আপনার—নীরা একবার থামল : তখন—সাহস সঞ্চয় করে নীরা কথাগুলোকে গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল : তখন বাবা আপনার মাকে একটা টেলিগ্রাম—

—কী বললেন !—অস্বাভাবিক গলায় প্রতুল এমন ভাবে চীৎকার করে উঠল যে আতঙ্কে আপাদমস্তক শিউরে গেল নীরার : কী টেলিগ্রাম করা হয়েছে মাকে ?

দুর্বল পায়ের ওপর ভর দিয়ে নীরা সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করতে লাগল। তারপর কয়েকবার নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে উচ্চারণ করল : দুঃসংবাদটা বাবা তাঁকে—

কয়েক মুহূর্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রতুল। কার্শিয়াঙে আসবার আগে মায়ের সেই মুখখানা ঘুরপাক খেয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। দোরগোড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। এত বড় পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ, একা, অসহায় মা। নিঃশব্দ আকুতির কান্না দিয়ে ভরে দিয়েছেন তার যাত্রা-পথ।

পরক্ষণেই নীরার পাশ কাটিয়ে তীরের মতো বাড়ির মধ্যে ঢুকল সে। টেনে বের করে নিয়ে এল নিজের স্যুটকেসটা, সোজা হন্ হন্ করে এগোল গেটের দিকে।

এতক্ষণ পরে নীরা যেন কথা খুঁজে পেল।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

মুখ না ফিরিয়েই প্রতুল বললে, কলকাতায়।

—সেকি ! বাবা মার সঙ্গে দেখা না করে—

—দরকার হবে না—শাণিত স্বরে প্রতুল জবাব দিলে, আমার হয়ে আপনিই জানিয়ে দেবেন তাঁদের।

—কিন্তু—নীরা ব্যাকুল হয়ে বললে, কিন্তু—শুনুন—

প্রতুল ফিরে দাঁড়ালো হঠাৎ। জন্তুর মতো. একটা আক্রোশ মনের মধ্যে ফেনিয়ে উঠেছে তার। নির্জন বাড়ি—সে আর নীরা ছাড়া আর কেউ নেই কোথাও। এখন যদি সে এতদিনের যা কিছু অপমানের হিসাব-নিকাশ শেষ করে যায়? যদি মেয়েটার দুগালে প্রচণ্ড দুটো চড় বসিয়ে দেয়—যদি গলাটা টিপে ধরে নিষ্ঠুর নির্মম মুঠোতে?

কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সে নয়। তাই ঘাতকের দৃষ্টি একবারের জন্যে বর্ষণ করেই সে দ্রুত এগিয়ে গেল পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে—ফিরেও তাকাল না তারপর। আর নীরা যেখানেই স্থাণু হয়ে রইল—এক ইঞ্চিও নড়তে পারল না।

পরদিন বেলা নটায় বাড়ির দরজায় পৌঁছুল প্রতুল।

বারকয়েক অধৈর্য কড়া নাড়বার পর দরজা খুলল নিঃশব্দে। উচ্ছ্বসিত আর্তকণ্ঠে প্রতুল ডাকল : মা!

কিন্তু মা নয়। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন পাশের বাড়ির ললিতবাবু। ঠিক নীরার মতোই চকিত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন।

—মা কোথায়?

ললিতবাবু জবাব দিলেন না।

—মা কোথায়?—প্রতুল প্রায় চীৎকার করে উঠল।

ললিতবাবু বললেন, ভেতরে এসো, বলছি।

হাওয়ায় পা দিয়ে একটা কাটা ঘুড়ির মতো টলতে টলতে বাড়ির মধ্যে ঢুকল প্রতুল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ললিতবাবু দাঁড়ালেন তাঁর মুখোমুখি।

হয়তো মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন—কিন্তু তার ভেতর দিয়ে

যেন সময়ের ঝড় বয়ে গেল—বয়ে গেল হাজার হাজার বছরের দুঃসহতম প্রতীক্ষা। তারপরে ললিতবাবু কথা বললেন।

মাত্র সংক্ষিপ্ত একটি কথা।

—পরশু বিকেলে সেই টেলিগ্রামটা পাওয়ার পরেই হার্টফেল করেছেন।

## —দশ—

কোথা থেকে কী খবর পেয়েছিল অপূর্ব। হঠাৎ একদিন প্রতুলের বাড়িতে এসে হাজির হল সে।

দরজা খুলে প্রতুল তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা শব্দ করে দু পা পিছিয়ে গেল অপূর্ব। ঠোঁটের কোনা থেকে ঠক করে মাটিতে পড়ে গেল পাইপটা।

—একী!

এক মাথা রুক্ষ চুল, এক গাল দাড়ি আর কোটরে বসা চোখ। প্রতুল হাসল, কিন্তু হাসিটা অপূর্ব সহ্য করতে পারলনা। প্রতুলের দৃষ্টিটা এড়াবার সুযোগ নেওয়ার জন্যেই যেন সে কিছুক্ষণ নিচু হয়ে রইল —পাইপটা তুলে নিতে যতটুকু সময় লাগা উচিত, তার চাইতেও কিছু বেশি।

—কী হয়েছে তোর?

—মা মারা গেছেন।

—মারা গেছেন? কী হয়েছিল?—অপূর্ব আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে কপালের ঘাম মোছবার জন্যে একটা রুমাল খুঁজতে লাগল আঁতিপাঁতি করে।

—নিজের সত্যকে বেচতে চেয়েছিলাম টাকার জন্যে। তারই মূল্য দিয়েছি।

—মানে? অপূর্ব বার দুই খাবি খেলো।

—ভেতরে আয়—বলছি।

ঘরে ঢুকল দুজনে। প্রতুলের স্টুডিয়োতে। ইজেলের ওপর ক্যান-

ভাসে একটা আরম্ভ করা ছবির কয়েকটা আঁচড় টানা কিন্তু বহুদিন তার ওপরে হাত পড়েনি। হালকা ধুলোর আস্তরের নিচে মোটা ব্রাশের কয়েকটা খয়েরী টান গোটাকতক শুকনো ক্ষতচিহ্নের মতো দেখাচ্ছে। রঙের পাত্রগুলোর ভেতরে মাকড়শার জাল। কয়েকটা ছবি কাত হয়ে ঝুলছে দেওয়ালে। খানকয়েক নিচে পড়ে আছে উবুড় হয়ে। শুধু এককোণায় তীরবিদ্ধ হরিণের একখানা বড় ছবি কাতর মৃত্যুযন্ত্রণায় যেন জীবন্ত হয়ে উঠে প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কোনোদিন কলালক্ষীর আসন মেলা ছিল এই ঘরে। আজ এখান থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর শ্বেতপদ্মের ছিন্ন পাঁপড়িগুলো শুধু ছড়িয়ে আছে ঘরময়।

উস্‌খুস্‌ করে উঠল অপূর্ব।

—দাঁড়িয়ে কেন? বোস—প্রতুল আহ্বান জানালো।

একটা টুল একটুখানি সরিয়ে নিয়ে অপূর্ব বসল। উল্‌টে পড়া একখানা ছবির ওপরেই কুশাসনটা ছড়িয়ে দিয়ে মেজেতে বসল প্রতুল।

—ছবির ওপরেই বসলি যে?

—চুলোয় যাক—প্রতুল গজরে উঠল। খোঁচা খাওয়া কোনো ঘুমন্ত বুনো জানোয়ারের মতো মনে হল আওয়াজটাকে। খানিকক্ষণ স্তব্ধতায় কাটল। মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেও অপূর্ব কিছু বলতে পারলনা, বিব্রত প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগল। শুধু তার চোখের দৃষ্টি বার বার গিয়ে পড়তে লাগল তীরবিদ্ধ হরিণটার যন্ত্রণা-কাতর চোখ দুটোর ওপর—মনে হতে লাগল ওর রেখাবদ্ধ বেদনাটা এই ঘরের মধ্যেও স্তব্ধ-পুঞ্জিত হয়ে আছে।

তারপর আর কিছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পাইপটা আবার ধরিয়ে ফেলল।

এতক্ষণ দেওয়ালের দিকে চোখ মেলে রেখেছিল প্রতুল, এইবার ফিরিয়ে আনল অপূর্বের দিকে। একটা বিষাক্ত তীব্র দৃষ্টি তার।

—কী হয়েছিল, শুনবি?

বেশিক্ষণ লাগলনা—মিনিট দশেকের মধ্যেই বলা শেষ হয়ে গেল।

যখন যে পাইপটা নিবে গেছে অপূর্ব টের পায়নি। এইবারে পাইপ নামিয়ে ছাই ঝাড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু কাঁপা হাতে তার সবটাই প্রায় ঝরে পড়ল ট্রাউজারের ওপর।

অনুতাপের আবেগতপ্ত গলায় অপূর্ব বললে, আমায় ক্ষমা কর।

—তোর কী দোষ। তুই তো ভালোই চেয়েছিলি।

অপূর্ব মাথা নিচু করে রইল। মনের ওপর থেকে ভার তবু নেমে যাচ্ছেনা। বেশ তো ছিল, ভালোই তো ছিল প্রতুল। নিজের অভাব, নিজের দুঃখ, চারদিকেব অশান্তির মধ্যেও শিল্পের সাধনা নিয়ে এক রকম করে তো কেটে যাচ্ছিল তার দিন। সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও নিজের জন্যে কোথাও একটা নিভৃত বিবর খুঁজে নিয়েছিল সে—যেখানে মায়ালোক থেকে তার উর্বশী আসত অভিসারে, ইলোরার গিরিকক্ষ থেকে কখন সেখানে পথ খুঁজে আসতেন বিস্মৃত কালের অনন্যা নায়িকা—তাঁর শ্রীঅঙ্গ আবৃত থাকত রক্ত কাঁচুলিতে, চারুকর্ণে দুলত শিরীষ, বালকুন্দানুবিদ্ধ অলক, 'লোধ্রপ্রসবরজসা' পাণ্ডু অধরে থাকত রহস্য নিবিড় সুস্মিতি; অজপাল গ্রামের ন্যগ্রোধ-মূলে সেখানে দাঁড়াতেন বুদ্ধসত্ত্ব, তাঁর সামনে কনক থালায় কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধে পায়সান্নের অর্ঘ্য নিবেদন করতেন সন্নতনেত্রা সুজাতা, ইরাণের রক্তিম দ্রাক্ষা-মদিরায়

পাত্র পূর্ণ করে লাস্যললিত পদক্ষেপে দেখা দিত সাকী, ঘুরন্ত পেশোয়াজের তলায় কটিবন্ধে দেখা যেত জড়োয়ার খাপে বঙ্কিম ছুরিকার ফণা।

স্বর্গোদ্যানের মতো স্বপ্নাতুরতার সেই নেশা থেকে কেন প্রতুলকে জাগাতে চাইল অপূর্ব? কেন তার নিঃশব্দ কোটর থেকে তাকে টেনে আনতে গেল এই রূঢ় আলোয়? একটা কঠিন সত্য হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে গেল। প্রত্যেকেরই সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে, নিজেকে নিয়ে সে সেখানে যেমন খুশি দিন কাটিয়ে যায়। সেই নির্বোধের নিজস্ব স্বর্গ থেকে তাকে উদ্ধার করতে চাইলেই তো তা করা যায় না। অনেক সময় তাতে উল্‌টো বিপত্তিই দেখা দেয়; ব্যক্তির পৃথিবী থেকে সকলের মধ্যে তাকে টেনে আনলে তার দুর্গতিই বাড়িয়ে তোলা হয়—মোচন করা যায়না।

অপূর্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল সব সময়ে সকলের জন্যে নয়।

—আমারই অন্যায় হয়েছে—অপূর্ব যেন স্বগতোক্তি করল।

প্রতুল এবার আর প্রতিবাদ করলনা। হয়তো করবার মতো উৎসাহই পেলনা খুঁজে। অপূর্ব আবার নড়ে চড়ে বসল, দু তিনটে কাঠি নষ্ট করেও নতুন করে পাইপটাকে ধরাতে পারলনা।

তারপর:

আমি যদ্দুর জানি, ব্রজেনবাবু তো লোক খুব খারাপ নন!—দুর্বল কৈফিয়ৎ অপূর্বের স্বরে।

—না, মহৎ লোক তিনি।

—মহৎ?—অপূর্ব তাকিয়ে রইল। খটকা বোধ করছে, প্রতুল তাকে ঠাট্টা করল কিনা বুঝতে পারছে না।

—হাঁ, মহৎ বই কি!—প্রতুল উঠে পড়ল, চলে এল টেবিলের কাছে। একখানা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বললে, এই ছাখ্।

—রেজিষ্ট্রি চিঠি? কী আছে এতে?

—দিন কয়েক আগে এসেছে মার নামে।—প্রতুলের গলা অল্প অল্প কাঁপতে লাগল: পড়ে ছাখ্।

খামটা খুলতেই বেরুল একখানা ছোট চিঠি, একখানা চেক তার সঙ্গে। পাঁচ হাজার টাকার চেক।

—চেকটা দেখছিস? ব্রজেনবাবুর চেক?—প্রতুল বিশ্রীভাবে হা হা করে হেসে উঠল: আমার মাকে পাঠিয়েছেন ব্রজেনবাবু। আমার অপঘাত মৃত্যুর জন্যে খেসারত পাঠিয়েছেন আমার মাকে!

—তাই নাকি!—অস্ফুটভাবে বললে অপূর্ব, কিন্তু কথাটা শোনা গেলনা। প্রতুলের সেই বিশ্রী হাসিটা আবার তেমনি ঘরময় ভেঙে পড়ছে।

—আমার মৃত্যুর খেসারত! মাত্র পাঁচ হাজার টাকা আমার জীবনের দাম? অ্যাম্ আই সেলিং সো চীপ্ নাউ-এ-ডেজ্? —চেক আর চিঠিটাকে দুমড়ে নিয়ে প্রতুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘরের কোনায়।

অপূর্ব স্তম্ভিত হয়ে রইল।

খানিক পরে হাসি থামাল প্রতুল। উঠে পড়ল আসন থেকে। অস্থিরভাবে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল ঘরময়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে ঘামতে লাগল অপূর্ব—মনে হতে লাগল গলার টাইটা ফাঁসের মতো তার দম আটকে আনছে।

আবার স্তব্ধতা।

নিজেকে খানিকটা স্বাভাবিক করে নিয়ে প্রতুল বললে, ব্রজেনবাবুকে

দোষ দিচ্ছিনা। যা ভালো বোঝেন তাই করেছেন। কিন্তু এ টাকা আমি নেবনা।

—নিবিনা কেন ?—অপূর্ব যেন সাহস পেল।

—বেঁচে থেকেও নেব মৃত্যুর মূল্য ?—আইনের দায়ে পড়ব যে!—তির্যক্ হাসি রেখান্বিত হল প্রতুলের মুখে।

—তা কেন ? ক্ষতি তো তোর হয়েইছে।

—ক্ষতি!—প্রতুল থেমে দাঁড়াল : অর্থাৎ আমি না মরি, আমার মা তো মারা গেছেন ?—প্রতুলের চোখ দপ দপ করে উঠল : আমার মায়ের জীবনের দাম ব্রজেনবাবুর কেন, পৃথিবীতে কারোই দেবার ক্ষমতা নেই!

অপূর্ব মাথা নিচু করে রইল।

প্রতুল ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিছু একটা করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। একখানা ছবিকে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, একটা তুলিকে তুলে নিয়ে মট্ করে ভেঙে ফেললে হাতের চাপে। তারপর টেবিলের একটা কোনা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শ্রান্ত পশুর মতো ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়তে লাগল তার। অপূর্ব আবার কথা খুঁজে পেল।

—যা হওয়ার সেতো হল। কী করবি এখন ?

—জানিনা।

অপূর্ব আমতা আমতা করতে লাগল : আমি বরং একটা নতুন লাইন দিচ্ছি তোকে। যদি সিনেমায় কিছু করতে চাস্—

—সিনেমা!

অপূর্ব থমকে গেল : মানে, খানিকটা ওয়ার্ক অব আর্টও বটে! সেখানে একটা স্বষ্টির আনন্দ তুই পাবি—বেশ আর্টিস্টিক সেট-টেট তৈরী

করতে হবে। ভুলে থাকতে পারবি কাজ নিয়ে, আর টাকার দিকটাও—

—কত টাকা?—প্রতুল শান্ত হাসি হাসল : মৃত্যুর দাম কি ওরা পাঁচ হাজার টাকারও বেশি দেয়?

অপূর্ব কুঁকড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, সব জিনিসকে যতটা খারাপ তুই ভাবছিস, হয়তো তা নয়।

—না, তা নয়। যত খারাপ আমি ভাবছি, তার চাইতেও অনেক বেশি খারাপ।

এর কোনো জবাব দেওয়া চলেনা। অন্তত প্রতুলের এই মানসিক অবস্থায় তা অসম্ভব। অপূর্ব নিঃশব্দে বারবার ঘাড় আর গলা মুছতে লাগল।

—কী করতে চাস তা হলে?

প্রতুল কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের জানালা দিয়ে। কিছুক্ষণ দেখল লাল রঙের তেতলা বাড়িটার মাথার ওপর নীল আকাশটার দিকে। একটা নিঃশব্দ-গভীর ধ্যান যেন তার চোখের তারায় ঘনিয়ে আসতে লাগল।

—যা করছিলাম।

—অর্থাৎ?

—যে পথে চলেছিলাম, সেই পথেই চলব। সাধনা করছিলাম, তাই করব।

—ক্ষিদে মিটবে?—অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা অপ্রিয় প্রশ্নকে অপূর্ব রোধ করতে পারল না।

—যতটুকু মেটে, তাই যথেষ্ট। বেশি মেটাতে গিয়ে এই যে পাঁচ হাজার টাকার চেক্ পেয়েছি। আরো দরকার আছে?

অপূর্ব সচেতন হয়ে উঠল। হাওয়া আবার উল্‌টো পথে বইবার উপক্রম করছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—তা হলে যা তোর ভালো মনে হয়, তাই তুই কর।

প্রতুল জবাব দিল না।

—আমি আজ যাই। কাল আবার আসব।

—আচ্ছা—জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রতুল সাড়া দিলে।

অপূর্ব একবার দাঁড়ালো—দাঁড়িয়ে রইল দ্বিধাভরে। যাওয়ার আগে বলে যাবে নাকি আরো কিছু, দিয়ে যাবে আরো খানিকটা সাধ্যমতো সান্ত্বনা?

কিন্তু আর সাহস হলনা। বাহু দুটোকে একবার ঝাঁকুনি দিয়ে শরীরের জড়তা কাটিয়ে নিয়ে মৃদু মন্দ পায়ে বার হয়ে গেল ঘর থেকে।

জানালার পাশে প্রতুল তেমনি করে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। হাঁ—নিজের সত্যকেই সে অনুসরণ করবে, চলবে নিজের সাধনার পথ ধরেই। ভুল হয়ে গেছে, দামও দিতে হয়েছে তার। কিন্তু জীবনের কোনো ক্ষতিই তো চরম ক্ষতি নয়। সমস্ত ভুলকেই শুধরে নেওয়া চলে, আবার আরম্ভ করা যায় গোড়া থেকে। সামনের ওই আকাশে—ওই একটুকরো বিখণ্ডিত আকাশে সে অনেক ছবির রঙের খেলা দেখেছে; এসেছে বর্ষার মেঘের কাজল রেখা, এসেছে শ্যামলী মেয়ের হাসির মতো স্বর্ণরেখিনী গোধূলি, সদ্যোবিধবার ললাটের মতো মোছা সিঁদুরের চিহ্নাঙ্কিত প্রথম প্রভাত; জ্যোৎস্নার রজনীগন্ধা কুচি কুচি হয়ে ওখান থেকেই তো ঝরে পড়েছে। থাকুক এই অন্ধ গলি, থাকুক গলির মোড়ে কশাইখানার নিহত পশুর মতো গ্যাসের দৃষ্টি, কিন্তু তবু তো এখানে উর্বশীর আসতে বাধা হয়নি, এখানে তো পথ ভুল করেনি বটিচেল্লির

ভেনাস্। হাঁ, ওই আকাশ তার আছে—ওই আকাশে আছে সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপট, ওখানে আঁকা আছে অ্যাট্‌লাণ্টার স্বর্ণমন্দিরে ভক্ত প্রেমিকের মুখচ্ছবি, ওখানে লেখা আছে মদন-মহোৎসবে মকরকেতুর বসন্ত দেউলে চম্পক-চামেলির অঞ্জলি।

আবার সে তার কাজ শুরু করবে।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে সে দেখল বিশৃঙ্খলতার শূন্য রূপটা। অনুতপ্তভাবে রঙের বাটিগুলোকে ঝাড়ল একবার, তূলিগুলোকে একটা একটা একটা করে সাজালো যথাস্থানে। কয়েকটা ছবিকে সস্নেহভাবে তুলে দিলে দেওয়ালের গায়ে।

কিন্তু—মা!

বুকের মধ্য থেকে একটা আর্ত কান্না ঠেলে উঠতে চাইল, প্রাণপণে সেটাকে সংযত করে নিলে। মা। মার কাছে অপরাধের বোঝা তার আর নামলনা। মায়ের ধিক্কারেই অভিমান করে সে টাকা রোজগারের জন্যে ছুটেছিল, কিন্তু মা যে আরো অনেক বেশি অভিমান করতে পারেন, সেইটেই যেন প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন।

প্রতুল আবার হাঁটু মুড়ে আসনের ওপর বসে পড়ল। বসে পড়ল মুখ গুঁজে। পীড়িত ক্লান্ত সময় চলল হাতের ঘড়িটার অক্লান্ত মুহূর্ত গণনায়।

খস্‌খস্ করে কী একটা উড়ে এসে তার পায়ের কাছে পড়ল। যেন জাগিয়ে দিতে চাইল তাকে।

প্রতুল চোখ মেলল। হাওয়ায় একখণ্ড সম্পূর্ণ খবরের কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে। কাগজটা হাতে করে এনেছিল অপূর্ব, যাওয়ার সময় ভুল করে ফেলে গেছে। সেই খোলা কাগজের আধখানা উড়ে এসেছে তারই কাছে।

খানিকটার ওপর চোখ পড়তেই তার নিরাসক্ত দৃষ্টিটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ তার উৎসুক হয়ে উঠল। বড় বড় হেড্‌লাইনে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সংবাদ। দুর্ঘটনা ঘটেছে নর্থ বেঙল এক্‌সপ্রেসে।

ব্যথিত কৌতূহলে কাগজটা তুলে নিয়ে খবরটা পড়তে লাগল প্রতুল। তারপর এক জায়গায় তার চোখ স্তব্ধ হয়ে গেল। একবার পড়ল, দুবার পড়ল, তিনবার পড়ল, বারবার পড়ল। কিন্তু ঠিকই দেখেছে সে, তার ভুল হয়নি!

হাত থেকে আবার কাগজটা পড়ে গেল, আবার উড়ে বেড়াতে লাগল মেজেতে। বজ্রাঘাতে মরে যাওয়া মানুষের মতো বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বসে রইল—সারা শরীরে এতটুকু স্পন্দন রইল না।

নিহতদের তালিকায় আরো অনেকের সঙ্গে পাশাপাশি দুটি নাম আছে।

'শিলিগুড়ির ডাক্তার শচীন মজুমদার, বয়েস বায়ান্ন, তাঁর মেয়ে সুজাতা মজুমদার, বয়েস উনিশ!'

সামনের একফালি আকাশটাও যেন একখানা পাথরের কপাটে আড়াল পড়ে গেল!

## এগারো

'আমি আমার আসব, আমি আবার আসব।'

মহানন্দার নির্জন তীর। দূরে পাহাড়ের নীলিম রেখা। ওই অবাস্তব হিমালয়ও একদিন প্রজাপতির মতো আকাশে ডানা মেলে দিয়েছিল। 'আমি আসব, আবার ফিরে আসব।'

শঙ্খশুভ্র আঙুলের ওপর প্রবালের মতো নোখগুলি—তাতে নেল-পালিশের রক্তগ্লানি নেই। এক মুঠো ফুলের মতো হাত। দিনান্তের ম্লান আলোয় মগ্ন শান্ত দুটি চোখ। পাশের ঘর থেকে রেডিয়োতে বাজছিল: 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি, এঁকেছি আজ বাসন্তী রঙ দিয়া—'

ভারী সুন্দর প্রোফাইল। এত সুন্দর যে বাসন্তী রঙ্ দিয়েও বুঝি তাকে ফোটানো যায় না। রেখার একটা কঠিন রূপ আছে, একটা বন্ধনের মধ্যে সে সব কিছুকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। সে তো দেহকেই ধরতে পারে; কিন্তু দেহ যেখানে দেহের সীমা ছাড়িয়ে একটা জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তিতে মুক্তি পায়, কোন্ রেখা রূপ দিতে পারে তাকে? দেহকে ফুটিয়ে তোলা যায় রঙ্ দিয়ে, ফোটানো যায় তার লাবণ্যকেও; কিন্তু দেহ যেখানে ব্যঞ্জনা হয়ে ওঠে, মূর্তি যেখানে ভাবমূর্তির মধ্যে বিস্তার লাভ করে—তাকে রঙ্ দিতে পারে কোন্ শিল্পী?

ভালোই হয়েছে—এ ভালোই হয়েছে। যেটুকু দেহ তোমার ছিল, সেটুকুর ভারও আর রইল না। এইবার শুধু তোমার সঙ্গে আমি ফিরে আসব না, আমার কাছেও তুমি আসবে। বাইরের রঙের সঙ্গে যত খুশি মনের রঙ্ও আমি মেশাতে পারব। তুমি দেখা দেবে হিমাদ্রি-লক্ষ্মী

হয়ে, তুমি দেখা দেবে বনশ্রী হয়ে, তোমার অপরূপ আবির্ভাব ঘটবে সাগরিকার মূর্তিতে। রবীন্দ্রনাথের মতো বলতে পারব: 'অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে আমারি এ রেখা বন্ধনে—'

এই ভালো—এই ভালো হয়েছে। এক মুহূর্তে তো সমস্ত ব্যবধান মিলিয়ে গেছে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে তিনশো মাইল পথ কোথায় গেছে ফুরিয়ে। সামনের ওই এক টুকরো আকাশে শিশির-ভেজা সকালে, মায়াভরা জ্যোৎস্নায়, রূপালি দুপুরে কত সহজে তুমি এসে দেখা দিলে। পথ চিনে আসতে তো তোমার এতটুকুও বাধা হল না। যে বন-গোলাপের গুচ্ছ সেদিন তোমার হাতে তুলে দিয়ে-ছিলাম, বিকেলের রক্তিম আলোয় তুমি তাদের এনে আমারি এই ঘরময় ছড়িয়ে দিলে।

ভালোই হল সুজাতা, ভালোই হল! এই ঘরে, এই দারিদ্র্যের মধ্যে কখনো কি তোমাকে আমি আনতে পারতাম। কোনোদিন কি তোমার আসন মেলে দিতে পারতাম এখানে? হয়তো আমার নিজের মধ্যেই বাধা জাগত, হয়তো তোমাকে চাইবার শক্তিও কোনোদিন জাগত না আমার ভেতরে। আমাকেই কি তুমি জীবনে মেনে নিতে পারতে! কীই-বা আমার তুমি দেখেছিলে, আমার কতটুকু পরিচয়ই বা তোমাকে আমি দিতে পেরেছি? কিন্তু হারিয়ে গিয়ে এই তো তুমি আমার কাছে এসেছ। শুধু তুমি আসোনি, তার সঙ্গে সমস্ত আকাশকে এনেছ—এনেছ তার শুকতারার দৃষ্টি, সপ্তর্ষির মণিহার; এনেছ দেবতাত্মা হিমালয়ের ঝাউবনের কোল থেকে ঝর্ণার কলধ্বনি, এনেছ লবঙ্গের গন্ধভরা দক্ষিণ সমুদ্রের বাতাস। সুজাতা, এবার আর কোনো ট্রেন দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তোমাকে হারাবার ভয় নেই।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় দেওয়ালের ছবিগুলো ঝলমল করতে লাগল।

নিজের সৃষ্টির দিকে নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল প্রতুল। এতদিন পরে তার স্টুডিয়োর চেহারা আবার সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। পুনর্জন্ম হয়েছে স্টুডিয়োর। এপাশে মার একখানা বড় ছবি; ভুলে গেছেন সমস্ত অপরাধ—যা কিছু অভিমান, তাকিয়ে আছেন ক্ষমা-সুন্দর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে। আর মার দু ধারে সুজাতার ভাবমূর্তি ভাবনার বাসন্তী রঙে রঙে ধরা দিয়েছ: হিমাদ্রি-লক্ষ্মী, বনশ্রী—সাগরিকা।

সব হারিয়েও সব পেয়েছে প্রতুল। কোনো বন্ধন-ভয় আর রইল না সংসারের কাছে—তাই শিল্পের শূন্যপটে তার উদার মুক্তি। মার চোখে দূর আকাশের নক্ষত্রের আলো, সুজাতার মধ্যে পৃথিবীর তিলোত্তমা আবির্ভাব!

নিঃশব্দে অপূর্ব এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। বিমুগ্ধভাবে বলে ফেলল, চমৎকার হয়েছে।

প্রতুল ফিরে তাকালো।

—চমৎকার!

—হাঁ, আশ্চর্য!—অপূর্ব একটা টুল টেনে নিয়ে বসল, তারপর ছবিগুলোর দিকে চোখ রেখে বললে, কন্‌ভেন্‌শ্যনাল আর্টের যুগ যে এখনো ফুরিয়ে যায়নি, তোর এই ছবিগুলো দেখে তাই বারে বারে মনে হচ্ছে। যাই বলিস, ফর্মের মধ্যে মস্তিষ্কের বাহাদুরী থাকলেও প্রাণের ছোঁয়া এখনো এতেই খুঁজে পাওয়া যায় যেন।

প্রতুল হাসল। ছোট একটা বক্তৃতা দিচ্ছে অপূর্ব। প্রাণের ছোঁয়া। শুধু ওইটুকুই বুঝেছে। কিন্তু আরো—আরো গভীরের মর্মলোকে সে কোনোদিন ঢোকবার পথ খুঁজে পাবে না। অন্তত কমার্শিয়াল্ আর্টিস্টের চোখ দিয়ে তো নয়ই।

—এক্‌জিবিশনে ছবি দিচ্ছিস না এবার?—অপূর্ব জানতে চাইল।

—কী হবে ?

—বা-রে !—বিস্মিত হয়ে অপূর্ব বললে, ঘরে টাঙিয়ে রাখবি নাকি তবে ?

—যা নিজের, তাকে নিজের জন্যেই রাখা ভালো। বাইরের চোখের সামনে তাকে ধরে দিয়ে লাভ নেই।

—বাজে কথা রেখে দে—অপূর্ব বিরক্ত হয়ে উঠল : শিল্পীর কোনো সৃষ্টিই নিজের জন্যে নয়। তার ওপর সারা পৃথিবীর অধিকার। শোন্—তোর ওই চারটে ছবিই আমি নিয়ে যাব।

—না, থাক।

—থাকবে কেন ?—অপূর্ব বললে, তুই নিজেই বুঝতে পারিস নি ছবিগুলো কী চমৎকার উত্‌রেছে। বিক্রী হলে বেশ ভালো দাম পাবি।

—দাম !—প্রতুলের চোখ হিংস্রভাবে ঝকঝক করে উঠল : নিজেকে বিক্রী করতে গিয়ে একবার অনেক ঠকাই আমি ঠকেছি। আর একবার সে ভুল আমি করব না।

অপূর্ব থমকে গেল।

—বেশ তো, বেচতে না চাস, নাই বেচবি। তবু দেশের লোককে এ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। লিখে দিস 'নট্ ফর সেল'—তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যাবে!

প্রতুল চুপ করে রইল। নট্ ফর সেল! তা মন্দ নয়। চারদিকের নকলের ভিড়ে একবার ওই প্রসন্ন চোখ মেলে মা আবির্ভূত হোন—প্রাণহীন রঙের অরণ্যে একবার সৌন্দর্যের আলোয় বিকসিত হয়ে উঠুক সুজাতা। পয়সার মূল্যেই যারা জীবনকে চেনে—দেয় আর্টের দাম, একবার অন্তত তারা জানুক—অর্থমূল্যেই জীবনের সব কিছু কিনতে পারা যায় না।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—ভাববার আবার আছে কী!—অপূর্ব নিশ্চিন্তভাবে কাঁধ ঝাঁকালো, তোর যদি কুঁড়েমি থাকে, আমিই নয় ছবিগুলোকে নিয়ে যাব।

* * * *

কিন্তু একটু বেশি আশাই করেছিল অপূর্ব !

বিরাট হলঘরের একান্তে শিল্পরসিক জনতার মধ্যে প্রতুল দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ হয়ে। দুদিকের দেওয়াল জুড়ে ছবির মেলা বসেছে। রঙের খেলা, রেখার উৎসব। চাষার কুটির থেকে হিমালয়ের স্তব্ধ তুষার পর্যন্ত জৈব আর ভৌগোলিক জগৎ রাশি রাশি ফ্রেমের বন্ধনে বন্দী হয়ে আছে। বাস্তব জীবনের নগ্ন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উড়ে চলেছে কল্পনার মানস-মরাল ; মাংসল স্থূলতার সঙ্গে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে ভাঙা চোরা রেখার ইঙ্গিতময়তা ; উজ্জ্বল দীপ্তিময় রঙের পাশে পাশে চলেছে হাল্‌কা রঙের বিষন্ন পাণ্ডুরতা ; সংযত পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি জেগে আছে বোহিমেবী প্রাণের অসংযমী খামখেয়ালী। মস্তিষ্ক আর প্রতিভার স্বপ্নিল আর কুটিল-বেণীর বিচিত্র গঙ্গা-যমুনা।

কিন্তু !

এতক্ষণে একটা কঠোর সত্য ধরা পড়ল তার কাছে। এত রকমের বিচিত্র মানুষ, এত বিভিন্ন রুচি, কিন্তু কই—তার অরণ্যলক্ষ্মীর কাছে তো ভিড় করে কেউ এসে দাঁড়াল না ! একবার শুধু কৌতূহলহীন দৃষ্টি বুলিয়ে গেল সাগরিকার ওপর, ভালো করে তাকিয়েও দেখল না মায়ের অপরূপ নক্ষত্রদীপ্ত চোখ।

তার স্টুডিয়োর নিজস্ব জগতে যারা আশ্চর্য একটা ধ্যানমগ্নতায় বিলীন হয়ে ছিল, এখানে তারা সাধারণ, অত্যন্ত সাধারণ হয়ে গেছে !

একটা হিংস্র ক্রোধে সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠল। অপূর্ব! অপূর্বই দায়ী এর জন্যে। কেন তার রাত্রির স্বপ্ন, কেন তার মনের নিভৃত অনুভূতিকে সে এমন করে বাইরে টেনে আনল? টেনে আনল এই হৃদয়হীন উপেক্ষার ভেতরে? না—আজই সে নিজের ছবি নিজের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

দুজন স্থুলাকার ভদ্রসন্তান তার সাগরিকার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জ্বলন্ত চোখে প্রতুল লক্ষ্য করতে লাগল তাঁদের।

—বেশ এঁকেছে, না?

অপরজন বললেন, হুঁ।

—কিনব নাকি? মন্দ হবেনা কিন্তু আমাদের নিউ ইয়ারের ক্যালেণ্ডারের জন্যে।

আবার ক্যালেণ্ডার! দপ দপ করে জ্বলে উঠল প্রতুলের মাথার মধ্যে। ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার ঘাড়ের ওপর একটা ক্রুদ্ধ বাঘের মতো সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

কিন্তু তার আর দরকার হলনা। দ্বিতীয় লোকটিই অবস্থাটাকে সহজ করে দিলেন, বাঁচিয়ে দিলেন একটা আসন্ন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাকে।

—কিনবে কি? দেখছ না—নট্ ফর্ সেল?

—তা হলে যেতে দাও। ছাখো—ওদিকে কিছু আছে কিনা।

হাঁ যাও, চলেই যাও তোমরা! এর মূল্য তোমাদের কাছে নেই, এর দাম দেবার স্পর্ধাও তোমাদের নেই! হঠাৎ গরীবদাসজীর লালসা-তরল মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল, কানে এল: হাঁ, একটু একটু নাঙ্গা নাঙ্গা ভাব থাকলে জমত ভালো। কাপড়া-উপড়া থোড়া উড়িয়ে টুড়িয়ে যাইত—

—রাস্কেল্!—নিজের অজ্ঞাতেই চাপা গর্জন বেরুল মুখ দিয়ে।

কিন্তু শেষেরটুকু বাকী ছিল তখনো।

প্রায় প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে দেখা দিল একটি মেয়ে। সযত্নে রুক্ষ করা একমাথা ববছাঁটা চুল, ঠোঁটে লিপস্টিকের রক্তরাগ, কানে রক্ত-প্রবালের দীপ্তি। মুহূর্তের মধ্যে চমকে উঠল প্রতুল। নীরা? পাশের দামী স্যুটপরা ছোকরাটাই বা কে? চক্রবর্তী?

না, নীরাও নয়—চক্রবর্তীও নয়। অন্য আরো দুজন। কিন্তু চেহারায় তফাৎ থাকলেও এক—একেবারে এক। ওদেরি স্বজাতি, সগোত্র, সহধর্মী।

মেয়েটি বললে, দেখেছ?—বনশ্রীর দিকে নেল্-পলিশের রক্তাঙ্কিত একটা দীর্ঘ আঙুল বাড়িয়ে বললে, কী চমৎকার এক্সপ্রেশন এসেছে!

ছেলেটি বললে, সো সো!

—তোমার ভালো লাগছে না?

ছেলেটি সমঝদারের হাসি হাসল।

—বড্ড সেকেলে। তবে হাঁ—ড্রয়িংটা মন্দ করে নি। আর কালার সেন্সও খুব ভালো নয়. বড্ড ছেলেমানুষী হয়েছে!

অসহ্য অর্থহীন জ্বালায় থর থর করে কেঁপে উঠল প্রতুল। এক মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল এই হলঘর, এই লোকের কোলাহল, এই ছবির অরণ্য। ছায়াবাজীর মতো সেখানে ভেসে উঠল আদিম হিমালয়ের বুকে আসন্ন সন্ধ্যার পদসঞ্চার। নীরা—চক্রবর্তী—অধ্যাপক দে! তাদের হৃদয়হীন হিংস্র হাসি ছাপিয়ে মনের কানে গম গম করে বেজে উঠল বাঘের গর্জন!

ছেলেটি বললে, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চলো—মডার্ণ স্কুল রয়েছে ওদিকে—

নীরা, চক্রবর্তী—দে! বাঘ নয়—ওরাই বাঘের মূর্তি ধরে এগিয়ে

আসছে! এতদিনের আদিম হিংসা যেন উন্মত্ত আক্রোশে প্রতুলের মধ্যে ফেটে পড়ল! আর ক্ষমা করা চলেনা—অসম্ভব!

—হোয়াট্!

আচমকা একটা অমানুষিক গর্জন করল প্রতুল। তারপর লাফ দিয়ে পড়ল ছেলেটির ঘাড়ে। চক্ষের পলকে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসল: আমি তোমায় খুন করব—আই উইল্ কীল্ ইউ।

আধঘণ্টা পরে প্রতুল নেমে পড়ল চৌরঙ্গীর রাস্তায়।

না, পুলিশে দেয়নি। সেটুকু অনুগ্রহ এখনো আছে এই সমাজের। শুধু পাগল বলে যথাসম্ভব মারধোর করে ঠেলে বার করে দিয়েছে রাস্তায়। গায়ের জামাটা ফেঁসে বেরিয়ে গেছে, কাটা ঠোঁটের ওপর এক চাপ রক্ত। আর ছাতা, ছড়ি—হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে, তাই দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছে তার হিমাদ্রি-লক্ষ্মী, তার বনশ্রী, তার সাগরিকাকে। তাদের জুতোর তলায় নিস্পিষ্ট হয়ে গেছে মায়ের স্নেহকরুণ চোখ।

প্রতুল হেঁটে চলল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে নেই—কোথাও কেউ নেই। তার শরীরের সমস্ত অণুপরমাণুগুলো কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যেন চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। একটা অর্থহীন আর ফাঁপা অস্তিত্ব নিয়ে লক্ষ্যহারা ফানুসের মতো প্রতুল ভেসে চলল। কোথায় যাবে জানে না, কোন্‌খানে পৌছুবে তারো কোনো নিশানা নেই!

—এই পাগ্‌লা!

একটা ছোট ঢিল ছিটকে এসে পিঠের ওপর পড়ল।

বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলো একটা কঠিন শক্তির আকর্ষণে এসে কেন্দ্রিত হল। শুধু কেন্দ্রিতই হলনা, জ্বলে উঠল দপদপ করে। আট থেকে দশ বছরের একদল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে। স্কুল থেকে ফিরছে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। ওই ছোট ঢিলটা তাদেরই সস্নেহ অভ্যর্থনা।

—এই পাগ্‌লা!—আর একজন ডাকল।

তীরবেগে তাদের দিকে ছুটল প্রতুল। ছেলের দল যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে চাইল, কিন্তু সব চাইতে ছোটটাই ধরা পড়ল প্রতুলের হাতে।

—খুন করে ফেলব—নরঘাতকের জিঘাংসায় তার গলায় প্রতুল যেন একটা থাবা বসিয়ে দিতে গেল। অন্য ছেলেরা তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। আর একবার পাগলের মতো ছুটে এল চারদিকের ক্ষিপ্ত জনতা। কাটা ঠোঁটের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়তেই আবার রেণু রেণু হয়ে গেল প্রতুলের সমস্ত সত্তা, একরাশ হাউইয়ের ফুলকির মতো আকাশের দিকে উৎসারিত হয়ে মিলিয়ে গেল। ফাঁকা অস্তিত্বের ফানুস্‌টা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল একরাশ ছেঁড়া কাগজের মতো।

তারপর যখন চোখ মেলে তাকালো, তখন কঠিন হাতে তার ঘাড় ধরে একটা ডাস্ট্‌বিনের পাশ থেকে টেনে তুলছে পাহারাওয়ালা। পাঁজরায় ব্যাটনের একটা খোঁচা দিয়ে বললে, চলো থানামে।

লালবাজারের লক্‌-আপে এসে একটা দুর্গন্ধ কম্বল মুড়ি দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে যেন একটা নিশ্চিন্ত ছুটি মিলেছে তার—পাওয়া গেছে পরম আশ্বস্তিভরা একটুখানি বিশ্রাম।

হাজতের সহবাসী পকেটমার দুখু মিঞা কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর একটা বিড়ি বের করে বন্ধু মানু

গুণ্ডার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, দেখছিস রে, শালা ভদ্দর লোকের কাণ্ড! বাইরে চিকণ-চাকণ হলে কী হয়, দিনে দুপুরেও মদ খেয়ে গড়াগড়ি দেয় রাস্তায়।

বিড়িটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল মান্থ। দর্শনিকের মতো জবাব দিলে, সব শালাই ওসোব কোরে দাদা—বদনামটা খালি হোয় তুমার আমার!

কিন্তু প্রতুল কিছু শুনতে পেলনা। তার দু চোখ ভরে তখন একরাশ ঘুম ঘনিয়ে এসেছে। নিশ্চিন্ত ঘুম—অতলান্ত রাত্রির মতো অনন্ত ঘুম।

## বারো

আরো দু মাস কেটে গেছে তারপরে।

শীতের সন্ধ্যায় একগুচ্ছ রজনীগন্ধা কিনে প্রতুল বেরিয়ে এল কলেজ স্ট্রীট্ মার্কেট থেকে। মুখে একরাশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি—অন্তত সাতদিন তাতে ক্ষুরের টান পড়েনি। মাথার চুলগুলো ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়েছে—জটা বেঁধেছে কানের দুপাশে। একটা ময়লা ওভার-কোটের পকেটে একহাত পুরে, আর এক হাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছটা আঁকড়ে ধরে সে অনিশ্চিত পায়ে হ্যারিসন রোডটা পার হয়ে গেল। প্রায় গা ছুঁয়েই বেরিয়ে গেল একটা চলন্ত ট্রাম।

কী একটা কটু গাল দিয়ে উঠল ট্রামের কণ্ডাক্টার। 'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন। গেল? কে গেল? প্রতুল ওয়াই-এম. সিয়ের সামনের ফুটপাথটায় উঠে এল। কে কোথায় গেল? নিজের কাজেই অর্থহীন কৌতূহলে প্রশ্নটা গুঞ্জন করতে লাগল সে। দু তিনজন মানুষ জিজ্ঞাসু ভাবে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তাকে, ট্রাফিক্ পুলিশটা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

কিন্তু কোনোদিকে লক্ষ্য করলনা প্রতুল। ডান দিকে একটা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল ভবানী দত্ত লেনে। একে শীতের সন্ধ্যা, তায় ছুটির দিন। একটা বিষণ্ণ কুয়াশায় ছোট রাস্তাটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রতুল তাকিয়ে দেখল—না, কোনোখানে কেউ নেই। আরো দু পা এগিয়ে সে একটা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। ওভারকোটের পকেট থেকে নীল নোটে ভরা আর একখানা হাত বার করে আনল, তারপর দু হাতে মুঠি করে ধরল রজনীগন্ধার গুচ্ছটা।

নরম ডাঁটাগুলো কঠিন হাতের মধ্যে নিঃশব্দে আত্মদানের মতো বিলীন হয়ে রইল। প্রতুল একবার ফুলগুলোকে মুখের কাছে তুলে আনতে চাইল—কিন্তু অন্ধকারে একগুচ্ছ শাদা ফুল আর একরাশ কুঁড়ির একটা শুভ্র কোমল আভাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। রাস্তার একটা সোঁদা গন্ধ, কুয়াশার মধ্য থেকে পোড়া কয়লার একটা শুষ্ক গন্ধ আর একটু দূরের ইউরিনাল্ থেকে একরাশ অ্যামোনিয়ার ঝাঁজ—সব কিছু ছাপিয়ে রজনীগন্ধার মৃদু সুরভিটা যেন কোমল চুম্বনের মতো প্রতুলের মুখের ওপর এসে পড়ল।

কিন্তু তবুও এক মুহূর্ত দ্বিধা করলনা প্রতুল। একটা একটা করে করে রজনীগন্ধার ফুল আর কুঁড়িকে সে বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে লাগল, তারপর নিষ্ঠুর ক্রোধে নোখের ডগায় সেগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল, পিষে তাদের রস নিষ্কাশিত করতে লাগল আঙুলের ওপর। তারপর শেষ কুঁড়িটিও যখন আর রইলনা, তখন একটা অপরিসীম উল্লাসে ডাঁটাগুলোকে বেশ করে মাড়াতে লাগল জুতোর তলায়।

আনন্দ—একটা অমানুষিক আনন্দ! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের ওপর সে শোধ নিচ্ছে। এম্‌নি করেই তার পাওনা আদায় করে নিচ্ছে কড়ায় গণ্ডায়।

কাজ শেষ করে প্রতুল ফিরে এল হ্যারিসন রোডে। পাশেই বিলিতী সিনেমার একটা পোস্টার; অর্ধনগ্না হেডী ল্যামার আধশোয়া ভঙ্গিতে একটা মদির কটাক্ষ মেলে তাকিয়ে আছে।

প্রতুল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। হেডী ল্যামার। সুন্দর মুখের রেখায় রেখায়, নীল নয়নের অপরূপ দৃষ্টিতে কামনার আমন্ত্রণ।

প্রতুলের দাঁতগুলো একবার ওষ্ঠের ওপর চেপে বসল। ওই দৃষ্টিকে সে নিবিয়ে দেবে—ওই মুখের চিহ্নও সে রাখবে না।

ধারালো নোখের একটি আঁচড়ে হেডী ল্যামারের একটা চোখ উপড়ে এল—ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল মুখের অর্ধেক। একটা অদ্ভুত তৃপ্তিতে প্রতুল পুলকিত বোধ করতে লাগল। রূপ! থাকো—ওই বিকৃত বিকলাঙ্গ হয়েই থাকো। কেউ আর তোমাকে চিনবেনা, ফিরেও তাকাবেনা তোমার দিকে।

ট্রাফিক পুলিশটা আবার দূর থেকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। প্রতুল আর দাঁড়ালনা। কলেজ স্ট্রিট পার হয়ে এগোল বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রিটের দিকে।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল তার পা।

সামনে জোরালো আলো জ্বলছে, ভেতর থেকে আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে অর্কেস্ট্রার শব্দ। একটা রঙীন্ পোস্টার ঘোষণা করছে: নৃত্যনাট্য শকুন্তলা। 'মরালী সংঘের' নিবেদন। শ্রেষ্ঠাংশে নীরা চৌধুরী, মমতা গুপ্ত, রীতা রায়, সুদীপা বসু এবং আরো অনেকে।

নীরা চৌধুরী! প্রতুল মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল অক্ষরগুলোর দিকে। জুনো—হেরা। কর্ণাভরণের রক্ত প্রবালের দীপ্তি নিষ্ঠুরতার দ্যুতির মতো ছড়িয়ে আছে গালের ওপর। কালো হিমালয়ের প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের অন্তরালে বাঘিনীর চোখ।

প্রতুল ভেতরে ঢুকল। সামনে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট বন্ধ। তার ওপাশে একটা বাব্‌রী চুল ছোকরা দু আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বালিয়ে কী একটা রসিকতা করছে একটি মেয়ের সঙ্গে। হাসির উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ছে মেয়েটি—উগ্র প্রসাধন সত্ত্বেও কালো ঠোঁটের ভেতর থেকে তার উঁচু উঁচু দাঁতগুলো বেরিয়ে আসছে বিশ্রী ভঙ্গিতে

প্রতুলের মুখের দিকে চেয়ে চমকে হাসি থামলে মেয়েটি—পিছিয়ে গেল দু পা। বাবরীচুল ছোকরার গালের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

—কী চাই আপনার ?

—ভেতরে যাব।

—কার্ড আছে ?

—না। টিকিট কিনব।

—এটা প্রাইভেট্ শো। টিকিট বিক্রী হবে না। যাঁরা ইন্‌ভাইটেড তাঁরাই শুধু ঢুকতে পাবেন।

—ওঃ!—প্রতুল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। গেটের ওপর থেকে দু জোড়া চোখ শঙ্কিতভাবে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

—কতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে শো ?

বাবরীচুল ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে নিলে—জবাব দিলেনা।

—কখন শো আরম্ভ হয়েছে ?

প্রতুলকে বিদায় করে দেবার জন্যে এবার মেয়েটিই দ্রুত কণ্ঠে জবাব দিলে : প্রায় ঘণ্টাদেড়েক। শেষ হয়ে এল বলে।

—ধন্যবাদ।

প্রতুল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল—বেরিয়ে গেল রাস্তায়। পেছন থেকে ভেসে এল এক ঝলক হাসির শব্দ—সেই সঙ্গে ছোকরার মন্তব্য : ভ্যাগাবণ্ড!

ভ্যাগাবণ্ড্—তাই বটে! প্রতুল ধীরে ধীরে কলেজ স্কোয়ারে এসে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসল। শীতের সন্ধ্যা—প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। প্রায়-নির্জন কলেজ স্কোয়ার, দু একটি মানুষ শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাস্থ্যের সন্ধানে। র‍্যাপারে মাথা মুড়ে লাঠি ঠুকঠুক করে যেতে যেতে

এক বৃদ্ধ একবার প্রতুলকে দেখে গেলেন, চশমার কাচের আড়ালে তাঁর চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে প্রতুল বসে রইল। ভাবছে, অথচ ভাবনার কোনো চেহারা নেই; কোথাও কোনো অর্থ-সঙ্গতি নেই চিন্তার। সামনে ম্লান কুয়াশায় ঢাকা গোলদীঘির কালো স্তব্ধ জলটা যেমন অর্থহীন—যেমন অর্থহীন একটা কঙ্কাল পঞ্জরের মতো ডাইভ্ বোর্ডটা, যেমন অর্থহীন ইউনিভার্সিটির শাদা অতিকায় বাড়িটার গায়ে কতগুলো নিয়নের বর্ণরাগ আর যেমন অর্থহীন পুঁটিরামের রাজভোগের একটা জ্বলন্ত প্রতিফলন ওই কালো জলটার ওপর—তেমনি তার চেতনার মধ্যে সব কিছু আছে, অথচ কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না। তারও মনের তরল কৃষ্ণতার ওপর সব কিছু প্রতিফলিত হচ্ছে—কিন্তু কোনো-টারই কোনো ভার নেই—শুধ্ একরাশ ঠিকরে পড়া আলো মাত্র।

কন্কনে ঠাণ্ডায় নাকটা যেন জমে আসছে, দুটো কানের গোড়ায় ছুরির পোঁচ লাগার মতো একটা জ্বালা। চোখ দিয়ে জল আসতে লাগল। প্রতুল তবুও উঠল না, যেখানে ছিল, সেখানেই ঠায় বসে রইল।

তারপর সামনের একটা সুইমিং ক্লাবের ঘড়ির কাঁটা যখন ঘুরপাক দিয়ে ন'টার ঘরে পৌছুল, তখন চারদিক মুখর করে প্রচণ্ড হাততালির শব্দ উঠল, উঠল মানুষের কলকণ্ঠ। প্রতুল উঠে দাঁড়াল। 'নৃত্যনাট্য শকুন্তলা' শেষ হয়েছে।

স্কোয়ারের বাইরে এসে রাস্তার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে রইল সে। ছায়ায় ছায়ায় যেখানে সাত আটখানা ছোট বড় গাড়ি পার্ক করা রয়েছে, দাঁড়িয়ে রইল তার পাশে। আর এতক্ষণ পরে পকেট হাতড়ে একটা সিগারেট বের করে ধরালো সে।

দুটি ছেলের সঙ্গে কলস্বরে কথা কইতে কইতে গাড়ির সামনে থমকে গেল নীরা। যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখদুটোকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

—একি! প্রতুল বাবু!

—চিনতে পেরেছেন তাহলে! —প্রতুল হাসল।

—সর্বনাশ—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার?—আন্তরিক সমবেদনায় নীরার স্বর কোমল হয়ে উঠল: কী হয়েছিল? অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি কোনো রকম?

—অসুখ? —প্রতুল আবার হাসল: হাঁ, করেছিল। এখন ভালো হয়ে গেছি।

—ওঃ! নীরা বলবার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর: তা এখন এখানে দাঁড়িয়ে যে?

—আপনার শো দেখতে এসেছিলাম। ঢুকতে পাইনি।

নীরা বিব্রত হয়ে উঠল।

—তাড়াতাড়ি অ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে, সকলকে কার্ড পাঠাতে পারিনি। ভুলচুক হয়ে গেছে অনেক।

—দেরী করে অ্যারেঞ্জ করলেও কি আমাকে কার্ড পাঠাতেন?—মৃদু হাসিতে প্রতুলের মুখ বিচিত্র হয়ে রইল। নীরা আরো বিপন্ন হয়ে উঠল: না—মানে—কথা হচ্ছে—তা আপনি যখন এসেই পড়লেন, তখন গেটের কাউকে দিয়ে ভেতরে খবর পাঠালেন না কেন আমাকে? আমিই সব ব্যবস্থা করতাম?

নীরার সঙ্গের একটি ছেলে চঞ্চল হয়ে উঠল।

—যাবেন না নীরা দেবী? রাত অনেক হয়েছে কিন্তু।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, যাই। আপনি কোন্‌দিকে যাচ্ছেন প্রতুল বাবু?

—আপনাদের উল্‌টো দিকে—প্রতুলের চোখের দৃষ্টি হঠাৎ স্থির হয়ে এল : তা সঙ্গে যখন আপনার গাড়ি রয়েইছে, তখন আমাকে একটা লিফ্‌ট দিয়েই দিন্‌না।

নীরা যেন বেঁচে গেল—যেন মুক্তি পেল এতক্ষণে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, মোস্ট্‌ গ্ল্যাড্‌লি !—আসুন। নীরা নিজেই দরজা খুলে দিলে : উঠুন। নীরদবাবু, আপনি সামনে বসুন, আমি আর প্রতুল বাবু পেছনে বসছি।

—আচ্ছা—অপ্রসন্ন হাঁড়ির মতো মুখ করে নীরদ ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল। নীরা আর একবার ডাকল : আসুন প্রতুল বাবু, আসুন।

গাড়ি চলল।

ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্যে উইণ্ড্‌ স্ক্রীনটা তুলতে তুলতে নীরা বললে, কিন্তু এতদিন আপনি বেশ ডুব মেরে ছিলেন যা হোক। একদিন আমাদের ওখানে গেলেন না, একটা খবরও নিলেন না।

—যাব ভাবছিলাম—প্রতুল সংক্ষেপে জবাব দিলে। আশ্চর্য লাগছে এই রাত্রিটাকে, আশ্চর্য লাগছে এই গাড়িতে নীরার পাশাপাশি বসে থাকতে। দুজনের মাঝখানে এক বিঘতের বেশি ব্যবধান নেই। নীরার শাড়ীর একটা আঁচল থেকে থেকে তার হাতে উড়ে এসে পড়ছে, নাকে আসছে তার দেহের গন্ধ—নারী-দেহের গন্ধ। গাড়ির আলো-আঁধারিতে থেকে থেকে যেন দেখা যাচ্ছে পোস্টারে আঁকা হেডী ল্যামারের সেই মুখ। ধারালো নোখ দিয়ে প্রতুল গাড়ির কুশনটাকে আঁকড়ে ধরল। কী হয়—যদি সে এক্ষুনি ওই রকমভাবে একটা থাবা দিয়ে আঁচড়ে নেয় নীরার মুখখানা—একটা চোখ উপড়ে নেয় তার ?

প্রতুলের হৃৎপিণ্ড দপ দপ করতে লাগল। এত জোরে যে মনে হতে লাগল—বাইরে থেকে কেউ বুঝি সে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাবে। সমস্ত শরীরকে শক্ত করে দিয়ে সে জিঘাংসার এই প্রচণ্ড উৎক্ষেপটাকে রোধ করতে চাইল।

—আপনার মা কেমন আছেন ?

কোমল স্নিগ্ধ গলার প্রশ্ন। কিন্তু ওই গলাটাকে টিপে ধরা যায়না ?

—খুব ভালো আছেন।

অন্ধকারে এবার প্রতুল হাসল কিনা বোঝা গেল না।

—যাক, ভালোই। নীরা একটু চুপ করে রইল : বাবা আপনার কথা প্রায়ই বলেন।

—হুঁ।

—সে ব্যাপারটার জন্যে সবাই ভারী লজ্জা পেয়েছেন। কাণ্ডটা প্রোফেসার দের জন্যেই হল। উনি এমনভাবে লাফিয়ে উঠে গাড়ির দিকে ছুটলেন যে আমরা সবাই ভাবলাম—বাঘটা বুঝি ঘাড়ের ওপরেই এসে পড়েছে। তারপরে আর—

—মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন। ভুল সকলেরই হয়ে থাকে—দাঁতে দাঁত চেপে প্রতুল বললে।

—আমিও তাই বলছিলাম—অনুতপ্তভাবে নীরা বলে চলল, আশা করি আপনি ওটা ভুলেই যাবেন। তা আসুননা একদিন আমাদের বাড়িতে। বাবা আপনাকে দেখলে ভারী খুশি হবেন।

—সত্যি নাকি ?—প্রতুল জিজ্ঞাসা করল।

তার গলার স্বরে নীরা চমকে গেল : বাঃ, কী আশ্চর্য ! নাঃ—আপনি দেখছি সে রাগটা এখনো পুষে রেখেছেন মনের মধ্যে !

প্রতুল কথা বলল না, নীরাও না। আবার চলন্ত আলো-অন্ধকার

ভরে উঠল নীরার দেহের গন্ধে, নারীদেহের গন্ধে; থেকে থেকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল হেভী ল্যামারের মুখ।

প্রতুল বললে, দাঁড়ান। এই আমার গলি—

—রোখো ড্রাইভার—একধরণের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ গলায় নীরা আদেশ দিলে। প্রতুলের মনে হল—ওইটেই স্বাভাবিক স্বর; এতক্ষণ ধরে ওর কণ্ঠে যে কেমন মাধুর্য ক্ষরিত হয়ে পড়ছিল, সেইটেই অভিনয়; নৃত্যনাট্য শকুন্তলার মতোই আর একটা সার্থক অভিনয়।

গাড়ি দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিলে।

গাড়ি থেকে পা বাড়িয়ে প্রতুল ঘুরে দাঁড়াল নীরার দিকে: আসুন না একবার।

—আমি? কোথায় যাবো?

—কেন, আমাদের বাড়িতে? এক মিনিটও নয়। মার সঙ্গে দেখা করে যাবেন একবার?

—এত রাতে?—নীরা ঘড়ির দিকে তাকালো: সাড়ে নটা বেজে গেছে যে!

—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে আসবেন। এতটা পথ যখন এসেছেন, তখন এটুকু সময় নষ্ট করলে আর কতটা ক্ষতি হবে আপনার? এলেনই যখন, গরীবের বাড়িটা একবার দেখে যান। মা ভারী খুশি হবেন।

—তাই তো!—নীরা অস্বস্তিভরে আবার ঘড়ির দিকে তাকালো: কিন্তু রাত যে অনেক হয়ে গেছে। তা গলিটা তো চিনেই গেলাম—আর একদিন নয়—

—ভয় পাচ্ছেন?—প্রতুল হঠাৎ মৃদুকণ্ঠে হেসে উঠল।

—ভয়—কী আশ্চর্য!—নীরার আঘাত লাগল: আপনার মার কাছে

যাব, তাতে কিসের ভয়? বলছিলাম, এত রাতে তো বেশিক্ষণ গিয়ে বসতে পারব না—আপনার মাকে হয়তো বিরক্তই করা হবে।

—আমার মা এত সহজেই বিরক্ত হন না।

—আচ্ছা, চলুন—প্রায় ঝোঁকের মাথাতেই নীরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল: নীরদবাবু, একটু বসুন, আমি পাঁচসাত মিনিটের মধ্যেই আসছি।

—আচ্ছা—হাঁড়ির মতো মুখ করে 'জেলাস' নীরদ সিগারেট ধরালো।

গলির মোড়ের গ্যাসটা থেকে মিনিট কয়েক দূরেই বাড়ি। নীরা একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখল। গাড়িটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—নিরাপত্তার আশ্বাস। নীরা স্বস্তিবোধ করল। তবুও—নীরদকেও ডেকে আনলে ভালো হত নাকি? কী জানি।

ভেজানো দরজাটা খুলে ফেলল প্রতুল। তালা আর দেয়না আজকাল—দেবার দরকারও হয় না। লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যার খুশি সেই আসুক। চোর—ডাকাত—পকেটমার।

নীরা একবারের জন্য থমকে দাঁড়াল দোরগোড়ায়।

—বড্ড অন্ধকার, না? দাঁড়ান—আলো জ্বালি—

ভেতরে পা দিয়ে প্যাসেজের আলোটা জ্বেলে দিলে প্রতুল। নীরা এবার এগোলো।

—মা কোথায় আপনার?

—ওপরের ঘরে শুয়ে পড়েছেন বোধ হয়।

—তা হলে এখন আর ওঁকে জাগানো—

—কিছু অসুবিধে হবে না। আসুন—এই আমার স্টুডিয়ো—হাঁ, এইদিকে। এখানে একটু বসুন, আমি ততক্ষণ মাকে ডেকে আনি।

স্টুডিয়োর দরজা খুলে প্রতুল বললে, ভেতরে আসুন—জ্বেলে দিচ্ছি আলো—

আলোকিত প্যাসেজ থেকে অন্ধকার স্টুডিয়োতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরা। বাইরের আবছা আলো পড়েছে ঘরে, কিন্তু কোনো কিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। শুধু কতগুলো জিনিসপত্র আর ছবির ছায়া-মূর্তি। তেল আর রঙের একটা বিমিশ্র গন্ধ।

—কই, আলো জ্বালুন ?

—হাঁ—জ্বালছি—

খট্ করে সুইচের আওয়াজ হল, আর সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সমস্ত ঘরখানা। মুহূর্তের জন্যে চোখে ধাঁধা লাগল নীরার, আর পরক্ষণেই অমানুষিক আতঙ্কে চোখদুটো তার বিস্ফারিত হয়ে গেল।

ঠিক তার মুখোমুখি দেওয়াল জুড়ে একখানা ছবি। মস্ত বড় ছবি।

কিন্তু এ কোন্ ছবি ? এ কি মানুষে আঁকতে পারে ? একটা অদ্ভুত—দানবীয় কল্পনা !

হা হা করে হাসছে একটা লোক। কালো মুখের পুরু পুরু ঠোঁট-দুটোয় বীভৎস রক্তের রঙ মাখানো—যেন রক্ত খেয়েছে। মুখের দাঁত-গুলো মানুষের নয়—যেন বাঁকা বাঁকা ক্যানাইন টিথ্। তার দু হাতের মুঠোতে সদ্যোজাত একটি শিশুর শরীর—নির্মল শুভ্র একটি নবজাতকের দেহ। দুটো রোমশ কঠিন হাতে লোকটা শিশুটির গলা টিপে ধরেছে। চোখ ঠেলে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে বাচ্চাটার—তার কষ বেয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত গড়িয়ে আসছে !

নীরা তিন পা পিছিয়ে এল।

—এ কী !

প্রতুল হঠাৎ ছবির ওই লোকটার মতোই হা হা করে হেসে উঠল। অম্‌নিভাবেই বেরিয়ে এল তার ক্যানাইন্ টিথ্—তার ঠোঁটদুটোকে অম্‌নি রক্তমাখা বলে মনে হল!

প্রতুল বললে, ও কী দেখছেন! আরো দেখুন।

আতঙ্কিত চোখদুটো দেওয়ালের দুপাশে একবার ঘুরিয়েই নীরা দুহাতে মুখ ঢাকল। শুধু ওই নয়। আরো আছে—আরো অনেক আছে! কোথাও একটা ময়াল সাপ একটি মেয়েকে পাক দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে হত্যা করছে কল্পনাতীত বীভৎসতায়; কোথাও একটা ডাইনির মুখ—দুটো জীবন্ত চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে দিয়ে এগিয়ে আসতে চাইছে নীরার দিকে—কোথাও একটা মানুষের বুকের ওপর থাবা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাঘিনী—কোথাও বা আদিম বর্বর পুরুষ কামলুব্ধ বাহু বাড়িয়ে ধরতে চলেছে পলাতকা নারীকে!

—চোখ ঢেকে বসে পড়লেন কেন?—আচমকা হাসি বন্ধ করলে প্রতুল: দেখুন, ভালো করে দেখুন। কার্শিয়াং থেকে এই আর্টের পশরা আমি মাথায় বয়ে এনেছি। এর জন্যে আপনাদের কাছেই আমি ঋণী!

আর্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল নীরা: ছেড়ে দিন দরজা—যেতে দিন—যেতে দিন আমাকে—

—যাবেন বই কি, ধরে আপনাকে রাখব না। কিন্তু নিজেদের কীর্তি একবার দেখবেন না? দেখুন—দেখুন, ভালো করে দেখুন?

—পথ ছাড়ুন—

—দেখুন না আর একটু—বেশ করে দেখে যান—আবার ঘর ফাটিয়ে প্রতুল হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দে মাথা ঘুরে গেল নীরার—যেন কোথা থেকে শক্ত একটা হাতুড়ির ঘায়ে সমস্ত চেতনা তার আচ্ছন্ন হয়ে এল।

একটু পরে প্রতুলের ঝাঁকানিতেই সে চোখ মেলল। মেলল মৃতের চোখ।

সেই বাঘিনীর ছবিটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে এনেছে প্রতুল। জোর করে নীরার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, এই এই, আপনার পোর্ট্রেট। একেবারে নিখুঁত। পাঁচ হাজার দাম এর—আপনাদের ঋণ শোধ করে দিলাম। এবার আপনি যেতে পারেন!

পুতুলের মতো নীরা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু নড়তে পারল না।

প্রতুল এবার গর্জন করে উঠল।

—এখনো দাঁড়িয়ে যে? যান—বেরোন—গেট্ আউট্—

মুহূর্তে পুনর্জীবন পেল নীরা। একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল মুখ দিয়ে—খানিকটা আর্তনাদ আর খানিকটা গোঙানির মতো মনে হল সেটা। পরক্ষণেই কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ছুটে পালিয়ে গেল উর্ধ্বশ্বাসে।

আর একবার ঘরফাটা হাসির ধমকে প্রতুল শতখান হয়ে গেল। তারপর বসে পড়ল, তারও পরে শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওদিকে বড় রাস্তা দিয়ে ষাট মাইল গতিতে নীরার মোটর তীরের মতো উড়ে গেল।

পরদিন সকালে প্রতুলের স্টুডিয়োতে ঢুকে স্তম্ভিত অপূর্ব দেখল মেজেতে অচেতন হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে প্রতুল। তীব্র জ্বরের ধমকে সারা গা তার পুড়ে যাচ্ছে, মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অর্থহীন ডিলিরিয়াম!

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব ডাক্তার ডাকতে গেল।

হাতের তুলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রতুল বললে, পারছি না, আমি আর পারছি না।

অপূর্বের স্ত্রী লেখা বললে, পারবেন না কেন? গোল্ড্ মেডালিস্ট্ আর্টিস্ট্ আপনি—এত ভালো আপনার হাত। পারবেন না কেন? আমার পোর্ট্রেট যদি ভালো হয়, তাহলে আজ সন্ধ্যায় এক ডজন মুরগীর কাটলেট্ খাওয়াব—নিজে ভেজে খাওয়াব।

কিন্তু এতবড় প্রলোভনেও প্রতুলকে উৎসাহিত দেখা গেল না। দু হাতের মধ্যে মুখ ঢাকল সে।

—না, না, কিছুতেই আমি পারছি না।—এই দেখুন—এক হাতে কাগজটা টেনে সে ছুঁড়ে দিলে লেখার দিকে।

নিজের ছবি দেখে লেখা শিউরে উঠল।

এ কার মূর্তি? চেয়ারে সিটিং দিয়েছিল সেই-ই, কিন্তু তার ভেতর থেকে এ কোন্ প্রেতাত্মাকে প্রতুল রেখার মুখে টেনে এনেছে! মানুষের একটা কাঠামো আছে, কিন্তু মানুষ নয়। পেন্সিলের প্রতিটি আঁচড়ে প্রতুল কোন্ এক রাক্ষসীকে বার করে এনেছে—বার করে এনেছে কোন্ অন্ধকারের আত্মাকে!

সভয়ে লেখা বললে, প্রতুলবাবু!

প্রতুল হঠাৎ মাথা তুলল। তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ক্ষিপ্ত নিশ্বাসের ঝড়।

—আমাকে কোনো কথা বলবেন না। আমি কী আঁকছি আমি জানি। কোথাও কোনো সুন্দরকে তো খুঁজে পাচ্ছি না! যেদিকে তাকাই একটা রাক্ষসের ছবি ছাড়া আর কিছুই তো দেখতে পাই না।

—পৃথিবীতে সবাই রাক্ষস নয় প্রতুল বাবু। মানুষ আছে, রূপ আছে—সব আছে এখানে। সেই জগতের সন্ধানই তো আপনার ছবির ভেতর দিয়ে আপনি এনেছিলেন! চোখ মেলে তাকান—যা হয়ে গেছে সমস্ত ভুলে যান তার। আপনার জীবনকে দেখুন—আবার ফিরে আসুন তার ভেতর!—ব্যাকুল হয়ে লেখা যেন তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল।

—ক্ষমা করুন আমাকে—আমায় একটু চুপ করে থাকতে দিন।

লেখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এল এল ঘর থেকে।

বাইরের বারান্দার রেলিং ধরে লেখা দাঁড়াল। একটা সীমাহীন সহানুভূতিতে তার সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে প্রতুলের জন্যে। যেদিন তার স্টুডিয়ো থেকে জ্বরের ঘোরে অচেতন অবস্থায় অপূর্ব তাকে তুলে আনে, সেই থেকে প্রায় এক মাস ব্রেইন-ফিভারে ভুগেছে প্রতুল। তার পর আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু শরীর সুস্থ হলেও মনের অসুস্থতা তার এখনো কাটেনি। জীবনের মধ্যে এখনো সে দেখছে অন্ধকার নরকের কালো ছায়া। মানুষের মুখ কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না, তার ভেতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে রাক্ষসের আদিম ক্ষুধা!

এ এক আশ্চর্য মানসিক ব্যাধি।

ঘরে ফুলদানী রাখবার জো নেই, জানালা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। রঙীন টেবিল-ক্লথ থাকলে ফেলে দেয় নিচে। একটা ফুলকাটা পেয়ালায় চা দিয়েছিল একদিন—আছাড় দিয়ে সেটাকে চুরমার করে ফেলেছে প্রতুল। যেখানে যা ছবি ঘরে ছিল, সব সরিয়ে নিতে হয়েছে।

ইন্‌স্যানিটি। এও একরকমের ইন্‌স্যানিটি বই কি। তা ছাড়া কী বলা যায় একে?

অপূর্ব বলেছিল, কী করা যায় ওকে নিয়ে? দিই না হয় একটা মেণ্টাল্ হস্‌পিটালে ভর্তি করে?

—না, না, ওসব নয়!—সমবেদনায় কাতর মন নিয়ে লেখা বলেছিল, আমাদের এখানেই থাকুন না কিছুদিন। ওটা একটা মেণ্টাল্ কমপ্লেক্স্, অসুখের আফ্‌টার এফেক্ট। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন।

কিন্তু একমাস হয়ে গেল তারপরে—এখনো প্রতুল স্বাভাবিক হয়নি। এখনো তার রূপকে ঘৃণা—সুন্দরকে ঘৃণা। তার পৃথিবী এখনো একটা অপঘাতের রক্তসমুদ্রে তলিয়ে আছে!

নানাভাবে প্রতুলকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে লেখা। আজ সিটিং দিয়েছিল তার নিজের একখানা পোর্ট্রেট আঁকবার জন্যে। সেই পোর্ট্রেটের রূপটা একটু আগেই দেখে এল সে।

—পারছি না, আমি পারছি না—

প্রতুলের স্বর তীরের মতো কানে এসে বিঁধছে। লেখা দাঁড়িয়ে রইল অন্যমনস্ক হয়ে।

টাই বাধতে বাঁধতে ঘর থেকে বেরুল অপূর্ব।

—কী হল? প্রতুল কী করছে?

—চুপ করে বসে আছেন।

—তুমি যে সিটিং দিয়েছিলে, কেমন হল ছবি?

—চমৎকার!—বিষণ্ণভাবে হাসল লেখা: দেখবে?—মুঠোর মধ্যে ছবিটা ধরাই ছিল, সেটা বাড়িয়ে দিলে অপূর্বের দিকে। কিন্তু ছবির ওপর চোখ পড়তেই টাইয়ের ফাঁস ভুল হয়ে গেল তার।

—এ কী কাণ্ড! এ যে পেত্নী দাঁড়ো করিয়েছে একটা!

—পেত্নী নয়—আমার পোর্ট্রেট!

—কী ভয়ঙ্কর!—অপূর্ব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল! তারপর ঘড়ির

দিকে তাকিয়ে বললে, আমি তাহলে এখন যাই—ওদিকে আবার আমার স্টুডিয়োতে পৌঁছুতে দেরী হয়ে যাবে। তুমি একটু নজর রেখো ওর ওপরে। আজ-কালের মধ্যেই একবার কোনো একজন সাইকো-অ্যানালিস্ট কনসাল্ট করতে হবে দেখি, তাতে যদি কিছু হয়।

অপূর্ব চলে গেল। লেখা পা বাড়াল নিজের ঘরের দিকে।

আর প্রতুল সেই যে বসে রইল, বসেই রইল। মনের মধ্যে কোথায় একটা বিশাল আগুনের কুণ্ড জ্বলছে তার ; সেই আগুনে টুকরো টুকরো হয়ে আহুতি পড়ছে উর্বশীর স্বপ্ন-কামনা; তাতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে বটিচেল্লির ধ্যানমগ্নিতা ভেনাস,—নীল সমুদ্রের তরঙ্গ দোলায় দোলায় শুক্তির শ্বেতকমলে আবির্ভূতা নগ্নিকা ভেনাস ; ম্যাডোনা-ডেল্-গ্র্যাণ্ডুকার মুখ সেই আগুনে পুড়ে এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পুড়ে গেল তার সুজাতা।—তার মা!

দু হাতে মাথার চুলগুলো সে টেনে ধরল। উপড়ে ফেলবে—সম্ভব হলে সমস্ত সমস্ত মাথাটাই যেন উপড়ে ফেলবে !

আরো দিন তিনেক পরে সকালবেলা লেখার ধাক্কায় অপূর্ব ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

—কী—কী হয়েছে ?

—প্রতুলবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সেকি কথা !

সন্ত্রস্ত হয়ে লেখা বললে, একে শরীর খারাপ, তারপর মাথার এই অবস্থা। কোথায় গেছেন, কী করে বসে আছেন কে জানে ! তুমি এখুনি বেরোও—ভালো করে খুঁজে দেখো—

সত্যিকারের বন্ধুর মতো তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে ছিটকে বেরুল অপূর্ব। খুঁজল থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে, কলকাতার

সম্ভব-অসম্ভব পথে ঘাটে, পরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিতের বাড়িতে বাড়িতে। কিন্তু কোথাও প্রতুলের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। পোড়া ছবির একরাশ ছাইয়ের মতোই হাওয়ায় কোথায় উড়ে গেছে সে।

সব শেষে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। অপূর্ব চেষ্টার ত্রুটি রাখল না।

সে বিজ্ঞাপন প্রতুলের চোখে পড়েনি। আর পড়লেই বা কী হত?

আরো এক মাস লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরপাক খেয়ে সে মাঝারি ধরণের একটা রেলস্টেশনে এসে নামল।

অচেনা জায়গা—অচেনা স্টেশন। কয়েকটা কেরোসিনের ল্যাম্প পোস্ট্ মিট্ মিট্ করছে কালো কাঁকরের প্ল্যাটফর্মে। একে দশটার ট্রেন, তার ওপর শীতের রাত। কোট আর চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ে কয়েকটা লোক ছায়ামূর্তির মতো সরে গেল এদিক ওদিক। স্টেশন-গেটের পথ না নিয়ে প্রতুল প্ল্যাট্‌ফর্ম ধরে সোজা সামনের দিকেই এগিয়ে চলল। বিনা টিকিটের যাত্রী সে—সোজা রাস্তা তার জন্যে নয়।

ছেঁড়া ওভারকোটের পকেটে হাত পুরে সে চলল। খানিকটা এগোতেই স্টেশনের নাম লেখা বড় বোর্ডটা দেখা দিল, সেটা পার হতেই প্ল্যাট্‌ফর্মটা ক্রমশ ঢালু হয়ে অন্ধকারের ভেতর একরাশ ঘন ঝোপের মধ্যে এসে ফুরিয়ে গেল।

হাঁটু পর্যন্ত ঝোপের ভেতর সেই অন্ধকারে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল প্রতুল। কোন্ দিকে যাবে এখন—কী করবে, কিছুই ঠাহর করতে পারছে না।

বাঁ পাশে চকচক করছে একজোড়া রেললাইনের ইস্পাত—তার ওপারে নিস্তব্ধ নিরেট জঙ্গল। ডান দিকে একটা তারের বেড়া, তার-

পরে বোধ হয় একটা পুকুর, তারও পরে কয়েকটা মিটমিটে আলো। কয়েকটা টিনের চালা যেন গায়ে গায়ে সাজানো আছে, সেই সঙ্গে খান-কয়েক কোঠাবাড়িও আছে মনে হচ্ছে। বোধ হয় বাজার।

তারের বেড়াটা টপকে সেদিকেই নামল প্রতুল।

পায়ের তলায় খানিক আবর্জনা আর কাঁটানটের জঙ্গল পার হয়ে প্রতুল আলোগুলোর দিকে চলল। ঠিক এই সময় ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে আরো ঠাণ্ডা খানিকটা শিহরণ বইয়ে দিয়ে বইল খানিক কনকনে দমকা বাতাস, আকাশে গুরগুর করে মেঘ ধমকে উঠল একবার। তারপরেই গলা বরফের ছিটের মতো কয়েক ফোঁটা হিমশীতল স্পর্শ প্রতুলের মুখে এসে পড়ল।

বৃষ্টি নামল।

শুধু নামল না, বেশ ভালো করেই নামল। বৃষ্টির একটা প্রচণ্ড ঝাপটা প্রতুলের সমস্ত চোখেমুখে হিমবর্ষণের মতো ঝরে পড়ল। আত্ম-রক্ষার একটা জৈব-প্রেরণাতেই প্রতুল ছুট লাগালো।

একটা ছোট মহকুমা শহরের মুখ এটা। মূল শহর মাইল তিনেক দূরে, এক্কা আর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানেরা যাত্রীদের তুলে নেবার জন্যে এই বাজারটুকুর মধ্যেই ভিড় করে। কিন্তু এই শীতের রাতে—বিশেষ করে দশটার ট্রেনে যাত্রী নামে না বললেই চলে। এক আধজন যারা নেমেছিল, তারা অনেক আগেই চলে গেছে—প্রতুল যখন প্রায় আধঘণ্টা ধরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সময়। এখন এক্কা ফিরে গেছে নিজেদের আস্তাবলে, যে দু একটি দোকান খোলা ছিল, বৃষ্টি নামতে দেখে তারাও তাড়াতাড়ি নিজেদের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে। নির্জন পথটার ওপর দাঁড়িয়ে প্রতুল শীতের বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল।

গায়ে মুখে বৃষ্টির জলে যেন ফোস্‌কা পড়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া

নাক-কানকে ছিঁড়ে উড়িয়ে নেবার উপক্রম করছে। পকেটের শেষ পয়সাগুলো কাল সন্ধ্যাতেই খরচ হয়ে গেছে, কয়েকটা বিড়ি ছাড়া সারাদিনে আর খাদ্য জোটেনি। ক্ষুধার্ত শীতক্লান্ত প্রতুল চাপা গলায় একটা অভিসম্পাত যেন উচ্চারণ করল।

একটা আশ্রয় চাই—কোথাও একটা আশ্রয় চাই তার। এই ঠাণ্ডায় এমন করে বৃষ্টিতে ভিজলে সে মরে যাবে। না—এখনি মরতে প্রস্তুত নয় প্রতুল। বেঁচে থাকবার কী প্রয়োজন আছে তা সে জানে না, কিন্তু সে কখনই এমন করে মরবেনা। কিছুতেই না। যেমন করে হোক—বাইরের পৃথিবীর এই নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আশ্রয় খুঁজে তাকে নিতেই হবে।

ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছে এখন, পায়ের তলায় ভিজে ধূলোর গন্ধটা একটু একটু করে মিলিয়ে গিয়ে কাদার সঞ্চার হচ্ছে। আর দাঁড়ানো যায় না। প্রতুল ক্ষ্যাপার মতো দু তিনটে বন্ধ দরজায় ঘা দিলে। বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দে হয় কেউ তা শুনতে পেলনা, নইলে শীতের এই নিশ্চিন্ত সুখশয্যা ছেড়ে উঠে তাকে আশ্রয় দেবার প্রয়োজনই অনুভব করল না কেউ।

প্রতুল ভিজতে লাগল—যেন মৃত্যুকে দেখতে লাগল চোখের সামনে। এই ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে এই নির্জন গ্রামের পথে সে মরে যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর কারো ক্ষতি নেই তাতে; লেপের উষ্ণ আশ্রয়ে আজ যারা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, তার জন্যে তাদের ঘুমে এতটুকুও ব্যাঘাত ঘটবে না। তারপর কাল সকালে উঠে যখন দেখবে, পথের ওপর একটা বিদেশী অচেনা মানুষ মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে, তখন কেউ হয়তো একবার 'আহা উহু' করে উঠবে, কেউ হয়তো তাও করবে না।

কথাটা ভাবতেই একটা ক্ষিপ্ত হিংসায় প্রতুল কঠিন হয়ে উঠল।

তাকে বাঁচতেই হবে—বেঁচে থেকে জানাতে হবে এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ। যেমন করে হোক, তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর এই চক্রান্তের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে তাকে। হাঁ—আশ্রয় তার চাই।

সরে এসে একটা মস্ত ঝাঁপে ঠেসান দিয়ে সে দাঁড়াল। বৃষ্টিটা এখন আর সোজা গায়ে লাগছে না বটে, কিন্তু ছাট্ সমানেই আসছে। কনকনে তীক্ষ্ণ হাওয়ারও বিরাম নেই। মরিয়া হয়ে প্রতুল ঝাঁপের তলাটা ধরে আকর্ষণ করল—খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল নিচে। তারি ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রতুল ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ওপারে বৃষ্টি—ঠাণ্ডা হাওয়া। এপারে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের দুর্গে এসে সে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে। কিন্তু এ কোথায় এল? প্রতুল চমকে গেল। এখানেও একটা অভ্যস্ত পরিচিত গন্ধ—রঙের গন্ধ!

এটাও কি কারো স্টুডিয়ো নাকি? এই অচেনা স্টেশনের পেছনে—এই অন্ধকার গ্রাম্য বাজারের ভেতর কে আবার এমন করে শিল্পের সাধনা করে চলেছে? এমন মূঢ় কে আছে এখানে?

হাঁ, সন্দেহ নেই! রঙের গন্ধ—তেলের গন্ধ। কৌতূহলটা আর দমন করা গেলনা। পকেট থেকে দেশলাই বার করে সে আলো জ্বালালো।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের আলোতেই একটা নতুন পৃথিবী দেখতে পেল প্রতুল। দেখতে পেল—সেই চকিত দীপ্তিতে প্রায় পঁচিশ জোড়া শান্ত কালো চোখ শঙ্কায় কাতর হয়ে লক্ষ্য করছে তাকে। তাদের নিভৃত-নিদ্রার অবসরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠে একটা দৈত্যকে যেন দেখতে পেয়েছে মুখোমুখি!

কুমোরের চালা। সরস্বতী পুজো আসছে সামনে, তারই ছোট বড় একরাশ মূর্তি। মোটামুটি তৈরী হয়ে গেছে, এখন শেষের কাজটুকু

শুধু বাকী। মরালাসীনা বাণীর শ্বেত-শুভ্র মৃন্ময়ীরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্যে অপেক্ষা করছে! প্রাণ-প্রতিষ্ঠা!

রজনীগন্ধা-ছেঁড়া আঙুলগুলো হিংসায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এখনি একটা কিছু করতে চায়—একটা ভয়ঙ্কর কিছু! ক্ষিপ্ত ক্রোধে প্রতুল ভাবতে লাগল—এই মুহূর্তে ওই শান্ত চোখ আর প্রসন্ন মুখগুলোকে আঘাতে আঘাতে সে চুরমার করে দেয়। রাখবেনা—পৃথিবীতে ওদের কারো অস্তিত্বই সে আর থাকতে দেবেনা!

প্রতুল আর একবার দেশলাই জ্বালালো।

ভাঙবে—ভেঙে চুরমার করে দেবে। কোথাও পাওয়া যাবে না একটা শক্ত লাঠি, কাঠের মুগুর জাতীয় একটা কিছু?

—কে—কে ওখানে?

মূর্তিগুলোর পেছন থেকে সাড়া এল। প্রতুল স্তব্ধ হয়ে রইল।

—কে ওখানে?

—আমি।

—আমি কে?—এতক্ষণে দেখতে পাওয়া গেল একটা টিম্‌টিমে লণ্ঠন জ্বলছে ঘরের দূরপ্রান্তে। এত ক্ষীণশিখা যে এখান থেকেও সেটাকে ভালো করে চোখে পড়েনি।

মাটি থেকে একখানা হাত সেদিকে প্রসারিত হয়ে বাড়িয়ে দিলে লণ্ঠনটাকে। অন্ধকার ঘরটা ভরে উঠল একটা বিষণ্ণ রক্তিম আলোয়। মুখের ওপর অন্ধকার ছায়া বয়ে সে মূর্তিগুলো যেন দুলে দুলে উঠল—যেন এতক্ষণে নীরবে প্রতুলকে একটা প্রতিবাদ জানাতে সাহস পেল।

একটি মানুষ উঠে দাঁড়াল। তারপর লণ্ঠনটা হাতে করে উঁচুতে তুলে ধরেই দেখতে পেল প্রতুলকে। এক মুখ দাড়ি, মাথায় বন্য চুল, গায়ের ভিজে ওভারকোটটা থেকে টপ টপ করে ফোঁটায় ফোঁটায় জল

পড়ছে। এই রাত্রে ঘরের মধ্যে এমন একটা উপস্থিতি কেউ আশঙ্কাও করে না।

লোকটা সভয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি ?

—আমি পথের লোক। বৃষ্টিতে ভিজছিলাম। ঝাঁপের তলা ফাঁক দেখে ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

—পথের লোক!—কুমোরের তবু সন্দেহ যায় না: কোথায় তোমার বাড়ি ?

—কলকাতায়।

—কলকাতায় ? তা এখানে কেন ?

প্রতুল জবাব দিল না।

কুমোর এতক্ষণে যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। গলার স্বর শুনে লোকটাকে তো চোর-ছ্যাঁচড় বলে মনে হচ্ছেনা। বরং সন্দেহ হচ্ছে ভদ্রলোকের ছেলে। পাগল-টাগল নয়তো ? বাড়ি থেকে পালিয়ে ফালিয়ে আসেনি ? বারকয়েক চিন্তা করে নিয়ে লণ্ঠন হাতে কুমোর এগোল। প্রতিমার সারির ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে একেবারে এসে দাঁড়াল প্রতুলের সামনে।

—বাড়ি কোথায় বললে ? কলকাতায় ?—লণ্ঠনের আলোটা একবারে প্রতুলের মুখের ওপর ফেলে জানতে চাইল সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল।

—তাই তো বললাম।

কুমোর এবার নিঃশব্দে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে তাকিয়ে রইল। আরো মিনিটখানেক পরীক্ষার পর একটা কিছু স্থির নিশ্চয় হয়ে জানতে চাইল: তুমি ভদ্রলোক ?

ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে প্রতুল জবাব দিলে, একদিন ছিলাম।

—ওঃ!—কুমোর ভ্রূদুটোকে সংকীর্ণ করে আনল: কী জাত? ব্রাহ্মণ?

প্রচণ্ড শীতের কাঁপুনির মধ্যেও এবার হা হা করে হেসে উঠল প্রতুল—হেসে উঠল পাগলের হাসি। চমকে তিন পা পিছিয়ে গেল কুমোর। হাসতে হাসতে প্রতুল বললে, ব্রাহ্মণ? হাঁ, ব্রাহ্মণও একদিন ছিলাম।

খানিক পরে যখন হাসি থামল, তখন প্রায় নিঃশব্দে ঠোঁটটা নড়ে উঠল কুমোরের।

—বুঝেছি ঠাকুর। অনেক দুঃখ পেয়ে সংসার ছেড়েছ। এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায় যাব?

—এসো, তোমার একটা শোবার বন্দোবস্ত করে দিই। বামুনের ছেলে সারারাত এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপবে নাকি? তা ছাড়া একেবারে তো ভিজেও গেছ দেখছি!

—আমাকে শুতে দেবে তোমরা?

—কেন দেবনা?

প্রতুলের চোখে মুখে সীমাহীন বিস্ময়ের ছায়া পড়ল: মেরে তাড়িয়ে দেবেনা? ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডায় বার করে দেবেনা একটা রাস্তার কুকুরের মতো?

—কী বলছ তুমি! একে ভদ্রলোক, তায় বামুনের ছেলে—অপরাধ হবে যে আমাদের। এসো—এসো—শুয়ে পড়বে। আজ সারাদিন কিছু খাওয়াও হয়নি বোধ হয়? দেখি—ঘরে চিঁড়েমুড়ি কিছু আছে কিনা।

—খেতেও দেবে ?—প্রতুল যেন একটা অন্ধকার সমুদ্র সাঁতরাতে লাগল। নতুন কোনো কূলের কাছে এসে সে পৌঁছেছে ; কিন্তু সেটাকে স্পষ্ট করে চিনতে পারছে না, বিশ্বাস করতেও পারছে না !

—আচ্ছা পাগল তো তুমি ! ঘরে অতিথি নারায়ণ না খেয়ে থাকলে পাপ হবে না গেরস্থর ? এখন এসো ঠাকুর—এদ্দিকে এসো।

প্রায় জোর করেই সে প্রতুলের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল ঘরের আর এক প্রান্তে। একটা ময়লা বিছানা নিচু তক্তপোষের ওপর ছড়ানো, তার ওপর ওয়াড়হীন বাঁদিপোতার অর্ধছিন্ন লেপ। মাথার কাছে দেশলাই, এক বাণ্ডিল বিড়ি। কুমোরের রাজশয্যা।

কুমোর বললে, একটু বোসো এই বিছানায়। বাড়ির মধ্যে খবর দিই আমি।

বিনা প্রতিবাদে বসে পড়ল প্রতুল। তার ইচ্ছার সমস্ত শক্তি হারিয়ে গেছে। অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতরে সাঁতরে এতক্ষণে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে —অসম্ভব ক্লান্ত। এইবার আর করার মতো কিছুই নেই। ঢেউয়ের হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছে—ঢেউ তাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাক।

—গগনের মা, ও গগনের মা—ডাকতে ডাকতে কুমোর ওপাশের একটা দরজা দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রতুল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কোনো কথা ভাবতে পারছে না, কিছুই না। তবুও থেকে থেকে আড়ষ্ট মস্তিষ্কের প্রান্তে প্রান্তে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে তার। অতিথি—আশ্রয়—খাদ্য। সরল বিশ্বাসে এখনো পথের লোককে ঘরে ডেকে আনে মানুষ ? এখনো কি এমন কথা বলতে পারে, ক্ষুধার্ত অতিথি ঘরে থাকলে অকল্যাণ হবে গেরস্তের ?

আশ্চর্য—ভারী আশ্চর্য ! পৃথিবীটা কি এখনো শেষ হয়ে যায়নি ? শেষ হয়ে যায়নি নীরা—অধ্যাপক দে, ইন্‌সিয়োরেন্সের দালাল চক্রবর্তীর

মধ্যে ? ফুরিয়ে যায় নি আর্ট একজিবিশনে সেই হৃদয়হীন জনতার ক্ষুধিত গর্জনে, লালবাজারের প্রস্রাবের গন্ধে দূষিত লক্-আপের কম্বল-শয্যায় ?

কতটুকুর মধ্যে কতখানি সময় পার হয়ে গেল জানেনা। সাড় এল কুমারের ডাকে।

—একবার গা তুলতে হবে ঠাকুর। তোমার ভিজে জামাটা খোলো, এই কাঁথাটা জড়িয়ে নাও। গামছা দিয়ে মুছে ফেল মাথাটা। তারপর যা হয় দুটি চিঁড়ে-কলা দিয়েই চালিয়ে নাও, এই রাতে তোমার সেবার জন্যে আর বিশেষ কিছুই করা গেলনা।

চারদিকের মূর্তিগুলোর মতো চিত্রকরা চোখ মেলে প্রতুল তাকিয়ে রইল, কোনো কথার কোনো অর্থবোধ এখনো সে করে উঠতে পারছেনা।

কুমোর আবার তাড়া দিলে।

—রাত করে কী করবে আর ? ওঠো—ওঠো। গগনের মা তোমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছে।

## চৌদ্দ

সোনার মতো ঝলমল করছে সকালটা।

সেই রোদে পিঠ দিয়ে মাটি সানছে বারো বছরের গগন, আর তার বাপ জয়দেব। একটু দূরে একটা ছোট কাঠের চৌকিতে বসে কৌতূহলহীন চোখে তাদের কাজ দেখছিল প্রতুল।

জয়দেব হঠাৎ প্রতুলের দিকে ফিরল।

—ত্থাখোতো ঠাকুর, এই মাটিতেই হবে না আর একটু আল্‌গা করব ?

প্রতুল বিষণ্ণভাবে হাসল : এতদিন ধরে তোমার কাজ তুমি করছ, আমি আর নতুন করে কী বলব ?

—কিন্তু তুমি তো আমার চেয়েও ভালো কাজ জানো। হবে এতে ? ..

—আর একটু ভূষি মেশাতে হবে মনে হচ্ছে।

—হুঁ, আমারও তাই সন্দো হচ্ছিল—মাটির তালের সঙ্গে আর এক খাবলা ভূষি মিশিয়ে নিলে জয়দেব। প্রতুল বসে বসে তাদের কাজ লক্ষ্য করতে লাগল। বেশ লাগছে এই নতুন জীবন। মস্ত উঠোনে আকাশ-ঝরা রাশি রাশি রোদ, শিশিরে ভেজা ঘন সবুজ পেঁপে পাতার কাঁপন—গোটা কয়েক শালিকের ধীর-গম্ভীর আনাগোনা। দূর থেকে ভিজে ঘাস আর সামনে থেকে কাদা মাটির গন্ধ—পৃথিবীর গন্ধ।

এক বুক ঘোমটা টেনে ঘর থেকে বেরুল জয়দেবের বৌ। শাম্‌লা রঙের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। পরনে জলচুড়ি পাড়ের ময়লা শাড়ী—একটু খাটো করে পরা; হাতে কয়েকগাছা রুপোর চুড়ির সঙ্গে শাদা শাঁখা।

একটা হুঁকো বাড়িয়ে নিয়ে সে প্রতুলের সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। তারপর প্রতুল হুকোটা তার হাত থেকে তুলে নিতেই আবার যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি ভাবেই ফিরে চলে গেল।

প্রতুল অন্যমনস্কভাবে বললে, নাও জয়দেব—

—তুমি আগে প্রসাদ করে দাও ঠাকুর, তারপরে হবে।

—নাঃ, আমায় অভ্যেস করিয়েই ছাড়বে দেখছি—নিরুপায়ভাবে কয়েকটা টান দিয়ে প্রতুল বললে, নাও।

—মাটিটা ভালো করে ঠাস্ গগন—আমি ঝট্ করে একটুখানি তামুক খেয়ে আসছি—একটা ঘটিতে হাত ধুয়ে নিয়ে জয়দেব উঠে এল, তারপর হুঁকোটা নিয়ে প্রতুলের পাশেই উবু হয়ে বসে পড়ল। যেন একটু অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-সালাপ করতে চায়।

ভুড়ুক ভুড়ুক কিছুক্ষণ চুপচাপ হুঁকো টানল জয়দেব। তারপর :

একা আর পেরে উঠিনে ঠাকুর। এই তো সরস্বতী পূজোর একরাশ বায়না চুকিয়ে দিলাম। দিনকয়েক যা খাটনি গেছে, নাওয়া-খাওয়াই ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে। ওদিকে আবার মাঘ-সংক্রান্তির মেলা পড়ছে দিন-দশেক বাদে। একটা পুতুল ছুঁইনি—অথচ তিন চারশো বিক্রী তো নির্ঘাৎ। শ খানেক টাকা আসত হাতে।

—তোমার ভাবনা কী? আর ক'দিন পরে তো গগন বড় হয়ে উঠবে।

—তা তো উঠবে। কিন্তু তারও তো দু চার বছর দেরী হবে। ততদিন সামলাই কী দিয়ে? ভাবছি কারিগর রাখব, কিন্তু আর কারুর হাতের কাজই আবার আমার পছন্দ হয়না। ভারী ল্যাঠায় পড়ে গেছি।

—কেন? আমাকে দিয়ে হবে না?—প্রতুল ম্লান হাসি হাসল।

—তোমাকে দিয়ে? সেকি কথা? তা কী করে হয়?—জয়দেব চমকে উঠল।

—চমকাবার কী আছে? আমি পারব না?

—পারবেনা কেন? তোমার হাতের কাজ তো দেখলাম। বাঘের মুখখানা যা বানিয়েছিলে, দেখলে ছেলেপুলে আঁতকে ওঠে। কেষ্টনগরের কারিগর ছাড়া অমন জিনিস করার সাধ্যিই নেই কারুর। আমার ভারী তাজ্জব লাগে। বামুনের ছেলে তুমি—এ সব শিখলে কোথায়? সাঁকরেদী করেছিলে নাকি কুমোরটুলীতে?

প্রতুল তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলে না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল একটু পরে।

—তাই বলো—নইলে এমন হাত হয়!

প্রতুল এবার জয়দেবের মুখের দিকে তাকাল: সেইজন্যেই তো বলছিলাম, মাঘ-সংক্রান্তির মেলায় তোমার এবার আর কিছু ভাবতে হবে না। চার পাঁচশো পুতুল তো? তুমি যদি একটু হাত লাগাও, সাতদিনের মধ্যেই করে দেব সব।

—ছি, ছি, তা কী হয়? তুমি বাইরের অতিথ মানুষ, দু চারদিনের জন্যে এসে ঠাঁই নিয়েছ গরীবের ঘরে। তোমায় এমন করে খাটাব?

—খাটাবে কেন?—হাতের কাছে যেন একটা অবলম্বন পেল প্রতুল: চুপচাপ বসেই তো আছি, বরং কাজ নিয়ে থাকলে সময়টা কাটবে ভালো। তা ছাড়া পুতুল গড়তেও আমার বেশ লাগে।

—তবু—

—তবু কেন? কারিগর রাখলে তাকে মজুরী তো তোমায় দিতেই হত। আমি তোমাদের ঘাড়ে বসে খাচ্ছি, এইটুকু উপকারেও লাগবনা?

—ছাখো ঠাকুর—জয়দেব ঠক্ করে হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রাখল : আমরা গরীব বলেই যা মুখে আসে তাই বলবে ? ফের যদি ওসব বলতে চাও, আমার গগনের মাথার দিব্যি রইল।

—কিন্তু—

—কিন্তু কী আবার! বিদেশী মানুষ—জাতে ব্রাহ্মণ, দুটি দিনের জন্যে আমার ঘরে পা দিয়েছ। তুমি ওসব বললে যে আমার নরকেও ঠাঁই হবেনা, জানো সে কথা? তোমার পুতুলও গড়তে হবেনা, বলতেও হবেনা এসব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমার ঘাট হয়েছে। আর কোনোদিন এসব উচ্চারণ করবনা মুখ দিয়ে। কিন্তু জয়দেব, পুতুল আমায় গড়তে দিতেই হবে, নইলে আমি থাকতে পারবনা।

—বুঝেছি। কাজের মানুষ—হাত গুটিয়ে পড়ে থাকতে জানো না। বেশ, করো যা তোমার খুশি। কিন্তু চারশো পুতুল গড়তে হবেনা তাই বলে, সে আমিই যে করে হোক সামলে নেব এখন।

—বাঘ, ভালুক, সাপ—এই সব জন্তু-জানোয়ার গড়ে দেব আমি।

—তাই দিয়ো। তোমার হাতে ওসব যা ওত্‌রাবে সে আর দেখতে হবেনা—জয়দেব হাসল : কিন্তু একটা কথা বলি ঠাকুর। হাত যশ্ব বলেই অমন পিলে-চমকানো পুতুল গড়তে যেয়োনা কিন্তু। কিনতে এসে যদি ছেলেপুলের ভিরমি লাগে, তা হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

—না, সে ভয় নেই। অত খারাপ পুতুল আমি আর করবনা।

—খারাপ নয়, খারাপ নয়—লজ্জিতভাবে যেন জয়দেব নিজের কথাটা শুধরে নিতে চাইল : আসল কথা, পুতুল তো। হুবহু একটা রাক্ষুসে বাঘ তৈরী না করে রঙ্‌-চঙ্‌ দিয়ে একটু সুন্দর করে দিলেই হবে আর কি!

জয়দেব উঠে নিজের জায়গায় চলে গেল।

একটু রঙ্‌ চঙ্‌ দিয়ে সুন্দর করে তোলা! সোনালি রোদের মদির উত্তাপে পিঠ দিয়ে সেটাকে উপভোগ করতে করতে কেমন হাসি পেল প্রতুলের। নতুন কথা কিছু বলেনি জয়দেব—নতুন দাবী তোলেনি কিছু। এ জীবনের দাবী, মানুষের দাবী, রূপস্রষ্টার কাছে সংসারের দাবী। তুমি শিল্পী—তুমি রূপকার—তুমি ধ্যান-সন্ধানী—স্রষ্টার তৃতীয় নেত্রের অবস্থান তোমার ললাটে। কিন্তু তোমার এই নেত্র থেকে সর্বনাশের আগুন ওঠে না— বিচ্ছুরিত হয় না মারণ-মন্ত্র; সেখানে সুন্দর স্বপ্ন দেখেন, মদন-ভস্মের আগুন নিভে গিয়ে সেখানে উমার অধর-বিম্ব প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। শিল্পের সেই মাধবী-মন্ত্রে আজ তুমি জাগো; তোমার রূপ-কামনার বর্ণলেপন বুলিয়ে আমাদের এই নগ্ন জীবনকে তুমি জীবনাতীত করে তোলো, আমাদের এই মৃত্যুর ওপর বিতরণ করো অমৃতলোকের প্রসাদমালা। তোমার মধ্যে দিয়ে আমাদের কঠিন পৃথিবী নতুন করে সৃষ্টি হয়ে উঠুক, আমাদের বাস্তবের শুকনো পাজরের ওপর অপ্রাপ্য স্বাস্থ্য আর অনায়ত্ত লাবণ্যের শিল্প-সুষমা বিস্তার করে দাও তুমি।

প্রতুলও কি তাই চায়নি? সেও কি পুতুলের মধ্যে সঞ্চার করতে চায়নি প্রাণাতীত প্রাণকে? জীবনের সমাধি-কক্ষের অন্ধ-বন্ধনে আনতে চায়নি একখণ্ড সূর্যোদয়ের আকাশকে? কোথায় ভেনাস্—কোথায় শাস্‌কিয়া—কোথায় ম্যাডোনা-ডেল-গ্র্যাণ্ডুকা! চোখের সামনে শুধু ইন্‌ফার্ণো—নীলাগ্নি-নরকের প্রেতদহন।

ভ্যান্‌গগ্‌! এই রূপের পুতুল একদিন ভ্যান্‌গগেরও এম্‌নি করেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর্ভিং স্টোনের অমর বইখানা একটা দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতির ওপর দিয়ে ভেসে গেল। আশ্চর্য—এখনো মনে

আছে! এত দুর্ভাগা, এমন চরম তিক্ততার মধ্য দিয়েও সে ভুলতে পারেনি। মনে পড়ছে 'লাস্ট্ ফর্ লাইফের' সেই নির্বাণ অধ্যায়—যেখানে অন্ধকার ঘরে নিজের 'ইয়েলো হাউস্ অব্ লাইট'-কে নিবিয়ে দেবার আগে শিল্পীর মনোমন্থন :

"What I am going to do with my life? I've kept alive these last miserable years because I had to paint, because I had to say things that were burning inside me. But there is nothing burning inside me now. I'm just a shell. Should I go on vegetating like those poor souls at St. Paul, waiting for some accident to wipe me off the earth?"

সেও কি অম্নি কোনো দুর্ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে? প্রতীক্ষা করে চলেছে মুছে যাওয়ার জন্যে? তারও কি প্রয়োজন তলপেটে বসিয়ে টিগার টেনে দেবার জন্যে একটিমাত্র রিভলভার?

কিন্তু!

প্রতুল যেন সচেতন হয়ে উঠল। একবার তাকিয়ে দেখল চারদিকে। পৃথিবী। শীতের সোনালি রোদে ঝলমল করছে—আকাশ থেকে সোনা ঝরে পড়ছে মাটিতে। এত রোদ কলকাতার গলিতে কোথাও ঢোকেনি—আকাশের ধোঁয়া আর ধুলোর কোন্ অন্ধকার খনির ভেতরে লুকিয়ে ছিল এই সোনা—এমন অপর্যাপ্ত হিরণ্যসম্ভার? শীতের পাতা ঝরানো এই নগ্নতার মধ্যে কী করে এমন পান্নার রঙ্ পেল পেঁপেগাছের ওই পাতাগুলো? কোনোদিন কি সে তাকিয়ে দেখেছে একজোড়া ছোট ছোট শালিকের পাখা কী উজ্জ্বল মসৃণ—তাদের ঠোঁটের হলুদ রঙে এমন নিপুণ শিল্পীর স্বাক্ষর?

তারপরে মানুষ।

কাশিয়াং পাহাড়ে নয়—আর্ট এক্‌জিবিশনে নয়—লালবাজারের লক্‌-আপেও নয়। এখানে আরেক রকমের মানুষ দেখতে পেল সে। শীতার্ত বর্ষার রাত্রে অনধিকারী আগন্তুককে লাঠির ঘা দিয়ে পথে নামিয়ে দেয়না—থুথু ছিটিয়ে দেয়না হিংস্র উল্লাসে। একরাতের অতিথিকে জোর করে ঘরে ধরে রাখে—স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, পরিচর্যা দিয়ে।

এই সাতদিন তো পার হয়ে গেল। প্রথম দু তিন দিন তার ক্রমাগত মনে হত—এরা যেন বিষ মিশিয়ে দেবে তার ভাতের সঙ্গে; রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে চমকে জেগে উঠত—মনে হত তার বিছানার পাশে একখানা ধারালো ক্ষুর নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নিশাচর ঘাতক—তার গলায় এখনি বসিয়ে দেবে সেটা। থেকে থেকে জয়দেবের চেহারায় সেই ঘাতকের মূর্তি আবির্ভূত হয়েছে, বারো বছরের গগনকে মনে হয়েছে কোনো ফণা-তোলা কেউটে, ঘোমটার আড়ালে তার মায়ের নিবিড় কালো চোখকে মনে হয়েছে যেন ডাকিনীর চাউনি।

কিন্তু।

প্রতুল তাকিয়ে দেখল। না—মানুষ। সহজ—স্বাভাবিক। গগন আর জয়দেব সকালের রোদে পিঠ দিয়ে মাটি ঠাসছে। অথচ তিনদিন আগেও এরা একটা হিজিবিজি অর্থহীন রেখার অরণ্যে যেত হারিয়ে; সেদিন এদের হাত থেকে একতাল মাটি আচমকা তুলে নিয়ে গড়ে দিয়েছিল একটা বীভৎস বাঘের মুখ। কিন্তু—

মিষ্টি রোদের সঙ্গে সকালের ঠাণ্ডা বাতাস অল্প তপ্ত হয়ে উঠছে—চোখে মুখে এসে পড়ছে প্রতুলের। যেন কোনো কিশোরী কুমারীর প্রথম চুম্বন—ভয়ের শীতলতার সঙ্গে আবেগের উত্তাপ। প্রতুল চমকে উঠল। বহুদিন—বহুদিন পরে এই বাতাস এসে লেগেছে গায়ে, আদিম

সমুদ্রে কামনা-লক্ষ্মী উর্বশীর আবির্ভাব-স্বপ্নে যে উত্তাপ বয়ে আনত কলকাতার বদ্ধ-গলিতে একটুকরো ভীরু বাতাস—ঠিক তেমনি! এও কি সম্ভব! সে কি আবার ফিরে আসছে মানুষের মধ্যে—আবার নেমে আসছে প্রেমোষ্ণ জীবনের নীড়ে?

কিশোর প্রেমের রোমাঞ্চের মতো কী একটা অনুভব করতে লাগল শরীরে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

মুখ ফিরিয়ে জয়দেব জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি ঠাকুর?

—হাঁ, ঘুরে আসছি একটু।

প্রতুল বেরিয়ে গেল।

এই ছোট বাজারটুকুর আড়াই মাইল দূরে মহকুমা শহর। আর বাজারের সীমা পার হলে তুদিকেই মাঠ—তরঙ্গিত মাটির অবাধ বিস্তার। এই শীতের দিনে সে মাঠে ফসল নেই—লাল্‌চে-সাদা বিস্তৃত মাটির ওপর রবিশস্যের বুটিদার কাজ। আম কাঁঠালের আড়ালে আড়ালে ছোট ছোট ঝোপের মতো টুকরো টুকরো গ্রাম।

শহরমুখী কাঁকরের রাস্তাটা ছেড়ে প্রতুল মাঠের এক ধারে নেমে পড়ল। হাঁটবে—খেয়ালখুশি মতো হেঁটে বেড়াবে। ততক্ষণে মাথার ওপর তপ্ত মদের মতো রৌদ্রের বর্ষণ হতে থাকুক—ততক্ষণে হাওয়া এসে ফুস্‌ফুস্‌টাকে পরিপূর্ণ করে দিক। মনের অন্ধকূপটা থেকে এখনো সে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে কিনা জানেনা—কিন্তু কোথাও একটা জানালা তার খুলে গেছে—নিশ্চয় খুলে গেছে!

চলতে চলতে একটা ছোট নদী তার পথ আটকে দাঁড়ালো। এই মাঠের মধ্য দিয়েই একটা কাল্‌ভার্টের তলা দিয়ে সে বয়ে এসেছে। অল্প একটুখানি নীল নির্মল জল, তলায় বালি দেখা যাচ্ছে, চিকচিক করছে নুড়ি—সেই নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে থেকে থেকে শিশু মাছের ঝাঁক খেলা

করে যাচ্ছে—রূপোর কণা ছড়িয়ে দিচ্ছে কেউ। নদীর জলে রোদ—নীলকান্ত মণির নিঃশ্বাসের মতো রঙ ধরেছে যেন।

নদীর ধারে খানিক বালির ওপর পা মেলে বসে পড়ল সে।

নদী! আর একটা নদী মনে এল। শিলিগুড়ির বিবিক্ত নির্জনতায় বিমর্ষ মহানন্দা। দিনান্তিক পাণ্ডুরতায় ওপাশে হিমালয় যেন ঘুমিয়ে পড়ছে। বুনো হাঁসের পাখার শব্দ। আর—আর পাশে সুজাতা!

সুজাতা!

তার স্বপ্নচারিণী—তার হিমাদ্রি-লক্ষ্মী—তার বনশ্রী—তার সাগরিকা! মুছে গেছে—একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় মুছে গেছে। জীবন থেকে সরে গিয়ে স্বপ্নাসন মেলেছে ভাবলোকে। কিন্তু সেই ভাবলোককেও মুছে দিয়েছে আর্ট এক্‌জিবিশন—আগরওয়ালার দল—একদল বন্য মানুষের ক্রোধক্ষিপ্ত গর্জন!

প্রতুলের মাথার ভেতরে আবার সব বিপর্যস্ত হয়ে যেতে লাগল। আবার সেই প্রাগৈতিহাসিক দানবটা জেগে উঠছে তার ভেতরে! আঙুলের মধ্যে আবার সেই রজনীগন্ধা ছেঁড়ার অনুভূতি উঠছে শিরশিরিয়ে—তীক্ষ্ণ নোখ্ বসিয়ে বসিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে বিদেশিনী বসন্তসেনার মদির-মুখ!

হাতের মুঠোয় একরাশ শুকনো ঘাসকে সে আঁকড়ে ধরল। উপড়েও ফেলত হয়তো, কিন্তু—

—কুল খাবি বাবু? মিষ্টি কুল?

নদীটা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল, এইবারে যেন সাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু জলের ভেতর থেকে নয়—ডাঙায়। ঠিক প্রতুলের পেছনটিতেই।

—কে?

দুটি গ্রামের মেয়ে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি—নইলে দেখতে পেত,

একটু দূরের কুল বন থেকে এতক্ষণ কুল পাড়ছিল ওরা। একটি বছর আঠারো—আর একটি বছর বাইশ। সাঁওতাল জাতীয় মেয়ে। শুধু একখানা করে শাড়ী জড়ানো কালো কালো রঙের সুঠাম শরীর—শিল্পীর লোভ জাগানো আদর্শ মডেল।

—কুল খাবি বাবু?

বড় মেয়েটি মাথার ঝুড়ি থেকে দু আঁজলা কুল নামালো। লাল আর হলুদ মেশানো পাকা পাকা রসালো টোপা কুল। প্রতুলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, নে—

কখন হাত মেলে দিলে প্রতুল, নিজেই জানেনা। যখন খেয়াল হল, তখন মাঠ ছাড়িয়ে লাল কাঁকরের পথের ওপরে উঠে গেছে মেয়ে দুটি, তাদের লাল আর শাদা শাড়ীর রং দেখা যাচ্ছে শুধু—দুটি রক্তজবা আর অপরাজিতা পাশাপাশি ভেসে চলেছে হাওয়ায়।

প্রতুলের কপাল কুঞ্চিত হয়ে এল। কেন দিল—এ ওরা কেন দিল তাকে? সে তো ওদের কাছে চায়নি। কিন্তু কেন অযাচিতভাবে দু হাত ভরে এই কুলগুলো ওরা ঢেলে দিল তাকে? কয়েক মুহূর্ত আগে তার মাথার ভেতরে আবার যে হিংসার আদিমতা উৎসুক হয়ে উঠছিল, একি তারই প্রতিবাদ? পৃথিবী কি আবার উপযাচিকা হয়ে তার প্রীতির অর্ঘ্য পাঠিয়ে তাকে জানিয়ে দিল: বেঁচে ওঠো—বেঁচে ওঠো তুমি! এখনো আমি শুকিয়ে পাথর হয়ে যাইনি, এখনো আমার বুক ছাপিয়ে রসের নির্ঝর তোমার জন্যে উছলে পড়ছে। তার অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো—ফিরে তাকাও, আমার দিকে ফিরে তাকাও—

অঞ্জলির মধ্যে একরাশ পাকা কুল নিয়ে বসে থাকতে থাকতে প্রতুল শুনতে পেল: পৃথিবীর সেই মর্মবাণী ক্রমশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে কথার সীমা—পেরিয়ে যাচ্ছে ভাষার রূপ। ক্রমশ তা সুর হয়ে উঠছে। একটা

অপরূপ সুরের নির্ঝরে এই মাঠের আকাশ-বাতাসকে ইন্দ্রজাল দিয়ে ভরে তুলছে।

দৃষ্টি চলে গেল নদীর ওপারে। খুব বেশি দূরে নয়—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটি সাঁওতাল দম্পতী একজোড়া ঘুঘুর মতো পরস্পরের গা ঘেঁষে বসেছে নিবিড়তম অন্তরঙ্গতায়। ছেলেটি বাঁশি বাজাচ্ছে—ভাবমুগ্ধ মেয়েটি তাই নিবিষ্ট মনে শুনছে উৎকর্ণা হরিণীর মতো।

হাত ভরে পৃথিবীর এই অঞ্জলি; আকাশ ভরে এই অপর্যাপ্ত হিরণ্ময় রৌদ্রের বর্ষণ; বাতাসে কুমারীর প্রথম চুম্বনের মতো শীতোষ্ণ আবেগ; প্রেমের মধুমায়ার মতো মাঠ ভরে এই বাঁশির সুর!

বিদ্যুৎবেগে প্রতুল উঠে দাঁড়ালো।

এখনি—এই মুহূর্তে। এখনি গিয়ে তাকে পুতুল গড়া শুরু করতে হবে। যতক্ষণ এই রোদ ঝরে পড়ছে চেতনার মধ্যে, যতক্ষণ হাতের এই মিঠে ফুলগুলো শুকিয়ে যায়নি, যতক্ষণ এই বাঁশির সুর মায়া রাগিণী হয়ে ঝরে পড়ছে—ততক্ষণ! ততক্ষণ তার পুতুলে রঙ্ লাগবে—ততক্ষণ তার পুতুলে ধরা পড়বে মানুষের মুখ।

আর দেরী নয়। এ সুযোগকে কিছুতেই হারাতে দেওয়া চলে না। মাঠের ভেতর দিয়ে প্রতুল প্রায় ছুটেই চলল।

## পনেরো

সারি সারি পুতুল! একটা নয়—দুটো নয়—প্রায় চারশো পুতুল।

প্রাণ খুলে রঙের বাহাদুরী করেছে প্রতুল। সোনালি, সবুজ, লাল, নীল, হলুদের দাক্ষিণ্যে যেন রামধনুর হাট বসিয়ে দিয়েছে। আলো হয়ে গেছে জয়দেবের দাওয়া।

প্রতুলের চাইতে উৎসাহ গগনেরই বেশি।

—আমি এটায় রঙ্ দিই ঠাকুর?

—দাও। কিন্তু দেখো, যেন খারাপ করে ফেলো না। একটু ভুল করে ফেললে তোমার বাবাই তোমাকে আর আস্তো রাখবে না—সেটা বুঝেছ?

—ছাখোনা তুমি। আমি একটুও ভুল করব না।

তাকিয়ে দেখে প্রতুল। দেখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে। সত্যিই—কোথাও ভুল করে না গগন। জাত শিল্পীর ছেলে, হাতের তূলিটা আপনা থেকেই ছন্দের মধ্যে ধরা দেয়—সুষম রেখায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়—একটুও বিচ্যুত হয় না। কোন্ রঙের সঙ্গে কী রঙ মিলবে, নিজেই সে ঠিক করে নেয়। পুতুলের মাথায় কালো রঙের পোচ্ বুলিয়ে দেয়—গালের হলদে রঙের ওপর দেয় একটু ফিকে গোলাপীর ছোপ, মুখের দুপাশে টেনে দেয় গভীর লালের সূক্ষ্মরেখা। রঞ্জনার জলে স্নান করেই নেমে এসেছে পৃথিবীর মাটিতে—ওর চোখের পক্ষ্মে সেই রঞ্জনার জলকণা জড়ানো—সমস্ত জগৎ সে কণাগুলোতে স্বপ্নের ইন্দ্রধনুতে প্রতিফলিত হয়ে যায়।

—পুতুল গড়তে ভালো লাগে গগন? —প্রতুলের আলাপ করতে ইচ্ছে হয়।

—খুব—মাথা নেড়ে গগন জবাব দেয়।

—কিন্তু কী হবে পুতুল গড়ে ?

প্রশ্নটার কোনো নিবিড় গভীর অর্থ গগন বুঝতে পারে না, চেষ্টাও করে না বোঝবার। একটা পুতুলে রঙের কাজ শেষ করে আর একটা হাতে তুলে নিতে বলে, কেন, বেচব ?

বেচবে! প্রতুল কিছুক্ষণ যেন কথা খুঁজে পায় না। আর্টকে বেচবে! কেমন একটা 'শক' লাগল মনে হয়। কিন্তু আজ আর তার সে গোঁড়ামি নেই। শিল্পকে যেদিন সে জীবনের অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, সেদিন ভেবেছিল তার ধ্যানের গভীর থেকে কণায় কণায় ভাবের অমৃত আহরণ করে সে যে উর্বশীরূপা রেখার মধুচক্র গড়ে তুলেছে, অর্থমূল্য দিয়ে তা কিনে নিতে পারে—এমন ঐশ্বর্য কারো নেই! সেদিন সৌন্দর্য ছিল বস্তুর বন্ধনহীন, একটা ভাবনির্ভর শূন্য প্রয়াণ ; সেখানে শিল্পী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। সেদিন সে ঘৃণা করত অপূর্বকে, ঘৃণা করত কমার্শিয়াল আর্টকে ; শিল্প কেবল আত্মরতির সঞ্চয়—এই বিশ্বাস নিয়েই কাল কাটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আর সে মুগ্ধতা তার নেই। নিজের স্বপ্নসৌধ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে একটু একটু করে এখন বিযুক্ত হচ্ছে তার দৃষ্টি। এই কুমোরের ঘরে এসে আর এক রূপ দেখল শিল্পের। এতো কমার্শিয়্যাল আর্ট নয়। সরস্বতীর মুখ গড়তে গিয়ে যে বিভোর তন্ময়তা ফুটে ওঠে জয়দেবের মুখে—যে মগ্নতায় তার চোখ যায় হারিয়ে—সে কি শুধুই অর্থকরী ? আজ এই মুহূর্তে পুতুলগুলোর ওপরে রঙ্ ফলাতে গিয়ে যে চরিতার্থতার দ্যুতিতে ঝলমল করছে বারো বছরের গগন—কেমন করে তাকে বলবে শুধু অর্থ আর স্বার্থেরই তাগিদ ?

তা হলে ?

কী একটা প্রশ্নের উত্তর সে নিজের কাছে খুঁজতে লাগল।

হাঁ, এও সৃষ্টি। এর মধ্যেও শিল্পী তপস্যা করছে পরিপূর্ণতার। কিন্তু তাই বলে চারপাশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ তো এর দাম দিতে কোথাও কার্পণ্য করে না! এই চারশো পুতুল মেলাতে পড়তেও পাবে না। মাটিতে যারা লাঙল চষে, দুঃখ-দারিদ্র্য আধি-ব্যাধির পীড়নের চাপে যারা প্রতিদিন লুটিয়ে আছে; অথচ একটি রক্তজবা আর একটি অপরাজিতা যাদের না চাইতেই অঞ্জলি ভরে ঢেলে দেয় পৃথিবীর রসের অর্ঘ্য—যাদের বাঁশি শীতের রোদভরা মাঠে প্রেমের ইন্দ্রজাল দেয় ছড়িয়ে—এই পুতুল—এই রূপকারুর মূল্য তো তারা বোঝে?

তা হলে?

এমনকি কোথাও আছে যেখানে শিল্প আর জীবন হাত ধরাধরি করে পাশে এসে দাঁড়ায়? এমনকি কোনো প্রাণতীর্থ আছে যেখানে মাটির ঘোলা গঙ্গাস্রোতে এসে মেলে আকাশী-বর্ণের নীল যমুনা, ঘটে রূপের সঙ্গে জীবনের প্রয়াগ-সঙ্গম?

হঠাৎ একটা ধিক্কারে যেন নিজেকে সজাগ করে তুলতে চাইল প্রতুল। দেখেছে—এতদিনে সত্যকে দেখেছে! এই সত্যের দিক থেকে সে সরে গিয়েছিল উর্বশীর কল্পনায়; এই মাটির জগৎকে হারিয়ে সে বাসা বাঁধতে চেয়েছিল নিরবয়ব আত্মসর্বস্ব আর্টের ত্রিশঙ্কুলোকে। কিন্তু সেখানে তো সে তার হাওয়াই মহল গড়তে পারল না। এল ঝড়—বজ্র পড়ল আকাশ চিরে, তারপর যথাসময়ে সে আবিষ্কার করল নিজেকে—দেখল লুটিয়ে আছে ব্যর্থতা আর ঘৃণার একটা পঙ্ক-শয্যায়!

আজ সেই পঙ্ক-শয়ন থেকে সে জাগছে। জাগছে পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে। যে পৃথিবীতে সহজ সাধারণ মানুষ বাস করে—যেখানকার

আদিগন্ত মাঠ রবিশস্যের ছোপ আঁকা আঁচল এলিয়ে দিয়ে শীতের রোদে ঘুমুতে থাকে, যেখানে বাঁশিতে বাঁশিতে নদীর জল ইন্দ্রনীল মণির তরল-ধারা হয়ে উল্‌সে ওঠে!

রূপ আর জীবন! নীল যমুনা আর ঘোলা গঙ্গা! এই পুতুলগুলোর মধ্যে সেই সঙ্গমের প্রাণতীর্থ! কেন—কেন এতদিন দেরী হল তার এই সহজ সত্যকে আবিষ্কার করতে? আকাশ-গঙ্গার স্রোতে ভাসতে চেয়েছিল বলেই উল্‌কার মতো সেখান থেকে সে ঝরে পড়ে গেল; মাটির গঙ্গায় ভাসতে পারলে মানুষের ঘাটে ঘাটে তার আশ্রয় মিলত।

প্রতুলের সমস্ত মন স্বচ্ছ হয়ে গেল। গগ্যাঁ নয়—ভ্যান্‌গগ্‌ নয়—উর্বশী নয়। এতদিনের দুঃস্বপ্নগুলো তার ফিকে হয়ে হয়ে সূর্যের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। শুকনো পাতা যা ঝরাবার, তা ঝরিয়ে দিয়েই ঝড় বিদায় নিয়েছে। এইবার নতুন অঙ্কুরের পালা—এইবার নতুন করে জীবনকে আস্বাদনের অধ্যায়।

আবার সে কলকাতায় ফিরে যাবে। আর একবার সাজিয়ে নেবে স্টুডিয়ো। কিন্তু এবার অফুরন্ত উপকরণ। দু হাত ভরে সে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে—তার ঐশ্বর্য আর ফুরোবেনা। নীরা তা কেড়ে নিতে পারবেনা, অধ্যাপক দের বিমূঢ় পাণ্ডিত্য তাকে নস্যাৎ করতে পারবেনা, কোনো এক্‌জিবিশনের জনতার সাধ্য নেই তার সেই জীবনলক্ষ্মী সুজাতাকে—তার সেই মাটির মাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়।

—একি হল ঠাকুর?

প্রতুল চমকে তাকাল। ঘরের মধ্যে বসে সরস্বতীগুলোর কাজ

শেষ করতে করতে কখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে জয়দেব—দাঁড়িয়েছে প্রতুলের পেছনে।

—এতো হলনা!—জয়দেব আবার জানালো।

—কেন, কী হয়েছে?—স্বাভাবিকতায় ফিরে এসে প্রতুল প্রশ্ন করল।

—বাঃ—এযে সব ভারী সুন্দর সুন্দর পুতুল! রাঙা বউ হয়েছে, লক্ষ্মী হয়েছে, কেষ্ট ঠাকুর হয়েছে, খাসা হয়েছে সব দেখতে। কিন্তু সে সব বাঘ-সিঙ্গী তো করলেনা? সেই রাক্ষসের চেহারা—সে সব দৈত্য-দানার মুখ?

—তাই তো—হলনা দেখছি!—প্রতুল হাসল।

—করলে কিন্তু পারতে দু চারখানা।—জয়দেবের স্বরে একটা ক্ষুণ্ণ অনুযোগ: ওগুলোতে তোমার ভারী হাত খোলে। দেখলেই পিলে চমকে যায়। অনেকে কিনত।

—কিন্তু অনেকের জন্যে আর কিছু করবনা জয়দেব। যা করব সকলের জন্যেই।

জয়দেব হাঁ করে চেয়ে রইল। কথাটার কোনো মানে সে বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না।

—বলছ কী তুমি ঠাকুর?

—বলছিলাম?—প্রতুল আবার হাসল: যে হাত দিয়ে বাঘ-ভালুক করতাম সে হাত দুটোকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। তারা হারিয়ে গেছে।

—হারিয়ে গেছে! হাত কি কখনো হারায়? হাত কি পাখী যে আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাবে?—

বোকার মতো বললে জয়দেব, প্রতুলের মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

—হাত ওড়েনা ?—প্রতুল জানতে চাইল।

—না।

—মাথা ?

—মাথা আবার উড়বে কী ?—জয়দেব মাথা চুলকোতে লাগল। এই চল্লিশ বছর বয়েসে অনেক মূর্তি গড়েছে, অনেক কারিগরকেও দেখেছে। কিন্তু কারো মাথা কিংবা হাত কোনোদিন উড়ে চলে যেতে পারে, এমন কথা সে শোনেনি।

অনেক ভেবে চিন্তে জয়দেব বললে, মাথা ঘোরে, কখনো কখনো ধরেও। কিন্তু কক্ষনো ওড়েনা ঠাকুর—উড়তেই পারেনা নিজে থেকে। অবশ্যি পেছন থেকে কেউ যদি রামদা বসিয়ে উড়িয়ে দেয়, সেটা আলাদা কথা।

—তাইতো হয়েছে জয়দেব।—প্রতুল দুষ্টুমির মৃদু হাসি হাসতে লাগল।

—সে আবার কী ?

—যে মাথার মধ্যে আমার বাঘ-সিংহ ভূত-প্রেত উপদ্রব করে বেড়াত, সে মাথাটা তুমি উড়িয়ে দিয়েছ। যে হাত দুটো দিয়ে জন্তু জানোয়ার গড়তাম, তুমিই তাদের আর চিহ্ন রাখোনি।

—অ্যাঁ!—বিস্ময়ে সরল চোখদুটোকে যথাসাধ্য বিস্ফারিত করলে জয়দেব। আর তার সেই চোখের অবস্থা দেখে প্রায় এক যুগ পরে প্রাণ-খোলা অট্টহাসিতে বিদীর্ণ হয়ে প্রতুল।

কিন্তু বিস্ময়ের কিছু বাকী ছিল প্রতুলেরও।

—জয়দেব আছো?—বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় কে ডাক দিলে।

জয়দেব বিস্ময় ভুলে গিয়ে চকিত হয়ে উঠল।

—ডাক্তারবাবু এসেছেন!—তারপর স্বর তুলে সাড়া দিলে, আসুন ডাক্তারবাবু। ভেতরে আসুন।

—আমাদের সরস্বতী দেখতে এলাম। কেমন হয়েছে—আগে থেকেই দেখে যাই।

উঠোনে পা দিলেন ডাক্তারবাবু। পেছনে পেছনে একটি মেয়ে। শঙ্খের মতো শুভ্র মুখ—চোখের তারায় সরস্বতী মূর্তির শান্ত গভীরতা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আকস্মিক অসংলগ্ন করে চীৎকার করে উঠল প্রতুল। কী বললে বোঝা গেলনা, তারপরে দুটো হাঁটু একসঙ্গে ভেঙে মাটিতে টলে পড়ল, শুয়ে পড়ল তারপরে।

ডাক্তার শচীন মজুমদার চমকে গেলেন—তাঁরও মুখ দিয়ে অস্পষ্ট শব্দ বেরুল একটা। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে পেছনের শঙ্খবর্ণা শুভ্র মেয়েটিকে ডেকে বললেন, মূর্চ্ছা গেছে। ওর চোখে মুখে একটু জল দাও সুজাতা!

এখানেও ঠকেছে প্রতুল—ঠকে গেছে নিজের এতটুকু অসতর্কতার জন্যে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আহত-নিহতের তালিকা দিতে গিয়ে ছাপার গোলমালে 'আহত-নিহত' শব্দ দুটো জায়গা বদল করে বসে ছিল বটে। কিন্তু আর এক পাতা ওল্টালেই তো ভ্রম সংশোধনটা তার চোখে পড়ত। এক বছর পরে এই মহকুমা শহরে শচীন মজুমদারের বদলি হয়ে আসা পর্যন্ত তো তাকে অপেক্ষা করতে হত না!

প্রতুলের কলকাতার স্টুডিয়োতে লঘু পায়ে ঢুকল সুজাতা। কিন্তু

ফাঁকি দিতে পারলনা। প্রতুল সজাগই ছিল। মুহূর্তে পেছন ফিরে হাত দুটো বন্দী করে ফেলল সুজাতার।

—আঃ—ছাড়ো—ছাড়ো—

—ছাড়বনা।—সুজাতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে প্রতুল বললে, তোমার পোর্ট্রেট আঁকা শেষ হয়ে গেছে আজ।

—সত্যি ?

—সত্যি।

—দেখি ?

দুজনে ইজেলের কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় সুজাতা ? মুখখানা তারই বটে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ণটা শঙ্খের মতো নয়—কৃষ্ণকলির মতো শ্যামল; মাথায় বিনুনিটা লীলাভরে দুলছেনা, সেখানে ধানের আঁটি।

—একী।

—এ পূর্ণতার রূপ সুজাতা। স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে ছুঁতে গিয়ে বার বার হারিয়েছি, জীবনের মধ্যে কেমন ফিরে পেলাম, দেখেছ ?

সুজাতা জবাব দিলেনা। প্রতুলের বুকের কাছ ঘেঁষে শান্ত তৃপ্তিতে স্তব্ধ হয়ে রইল।

—খুশি হয়েছ সুজাতা ?

কথার চাইতে অনেক বেশি নিবিড়তার বাণী বয়ে সুজাতা প্রতুলের মুখের দিকে তাকালো।

—তা হলে শিল্পীর পুরস্কার ?

অসম্ভব লোভী প্রতুল—তর সইলনা। পুরস্কারটা চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে নিলে।

শঙ্খশুভ্র মুখখানা সিঁদুরের মতো টকটকে রাঙা হয়ে উঠল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুহূর্তে দূরে সরে দাঁড়ালো সুজাতা। তারপর চাপা গলায় তর্জন করে বললে, সিঁড়ি দিয়ে বাবা আসছেন যে—জুতোর শব্দ শুনতে পাচ্ছনা ?

কলকাতা

আশ্বিন, ১৩৫৮